

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালির স্বাধীনতার সনদ। এই ভাষণের মধ্যেই তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। এই ডাকে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত আহ্বান।

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।.... প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

সরকারের নাকের ডগায় বসে এ ধরনের ডাকে ছিল মুক্তির আহ্বান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডাক কোনো সেনাপতি বা সমর-নায়কের ডাকে শুরু হয়নি। এটা ছিল দীর্ঘদিনের রাজনীতির ফসল।



এই ৭ই মার্চের ভাষণই এদেশের মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চরম আহ্বান। ২৫ শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বঙ্গবন্ধুর প্রতি জনমত বাড়তে থাকে। এর পরে স্বাধীনতা সহজতর হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার পথ সুগম করার অপরাধে পাক সামরিক সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের ভয়ে তারা তা কার্যকর করতে পারেনি। যার জন্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তারা তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ যারা মেনে নিতে পারেনি তারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পাকিস্তানি অনুচর, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ভাবশিষ্যরা এবং জামায়াতপুষ্ট স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বাংলাদেশের সরকারকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করে। তাদের স্বপ্ন ছিল আবার পাকিস্তান আসবে।

পৃথিবী অনেক বড়। অনেক জাতির বসবাস এ পৃথিবীতে। এক এক জাতি এক এক দেশে বসবাস করে। তাদের ধরনও আলাদা। আমরা বাঙালি জাতি। পৃথিবীতে আমাদেরও একটা আলাদা পরিচয় আছে। আলাদা কৃষ্টি আছে। আছে বাঁচার গৌরব। আছে জাতীয় আভিজাত্য। আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। সে দেশটির নাম বাংলাদেশ। প্রতিটি স্বাধীন দেশের মতো আমাদেরও রয়েছে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। রয়েছে লাল-সবুজ এর মিশ্র জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। রয়েছে জাতীয় ফুল, জাতীয় ফল, জাতীয় ভাষা, জাতীয় মাছ–আরো কত কি! এ যে কত আনন্দের, কত গর্বের– সে শুধু আমরাই জানি। স্বাধীনতার সুখ কত মধুর তা আমরা জানি।

আমাদের কষ্টে অর্জিত যে স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের এত গর্ব, এত আনন্দ– সে স্বাধীনতাকে আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম পাকিস্তানিদের কাছ থেকে। আর এ জন্যে আমাদেরকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল এক মরণপণ যুদ্ধে। ১৯৭১-এ সে যুদ্ধ ছিল মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে প্রাণ দিতে

হয়েছিল তিরিশ লাখ বাঙালিকে। স্বাধীনতা আদায়ের প্রশ্নে জাতি হয়েছিল দুর্জয় সাহসী–হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ। জীবন দিতে রাজি হয়েছির তারা।

এ সময়ে জাতির এই একতা আর দেশপ্রেমের পেছনে যাঁর অবদান ছিল সবচে বেশি, তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টা আর নির্ভীকতায় অনুপ্রাণিত হয়ে জেগে উঠেছিল একটি নির্যাতিত পরাধীন জাতি। খালি হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে পরাজিত করেছিলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এক সামরিক বাহিনীকে। যা ছিল অকল্পনীয় এ সবই সম্ভব হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানের সঠিক নির্দেশনায়। তাই শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছেন এক প্রাতঃস্মরণীয় নাম এ দেশের ঘরে ঘরে। যতদিন এদেশে একটি মানুষও বেঁচে থাকবে–অন্তত ততদিন তার বুকে বেঁচে থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁকে জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ইতিহাসের পাতায়। জানতে হবে তাঁর জীবন সম্পর্কে। কোথা থেকে এসে জাতিকে কোথায় নিয়ে গেলেন তিনি। তৎকালীন ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলা তারিখ অনুযায়ী সে দিনটি ছিল ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র, মঙ্গলবার। রাত আটটার সময় জন্ম হয়েছিল তাঁর। তাঁর জন্মটা ছিল দেশের জন্য এক আনন্দবার্তা।

শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান। মাদারিপুর দেওয়ানি আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন তিনি। সৎ, দয়ালু, আর প্রতিবেশীদের মঙ্গলকামী বলে পরিচয় ছিল তাঁর। ওদিকে মুজিবুর রহমানের মাতা সাহেরা খাতুনও ছিলেন যেমন ধার্মিক ঠিক তেমনি স্নেপরায়ণ। গাঁয়ের গরিব-দুঃখী মহিলাদের সাধ্য মতো সাহায্য করতেন তিনি। এতিম অসহায়দের আশ্রয় দিতেন নিজের বাড়িতে। পিতা-মাতার এই ভালো গুণাবলীরই অধিকারী হয়েছিলেন শেখ মুজিব। আর তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব, যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে স্বাধীনতার দাবিতে একতাবদ্ধ করতে



বংশ পরিচয়

আমাদের জানা মতে, শেখ মুজিবুরের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল ইরাকে। বিখ্যাত আউলিয়া হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর (র) সাথে ইসলাম প্রচারের জন্যে যেসব ভক্ত খাদেমরা এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের ভেতর একজনার নাম ছিল দরবেশ শেখ আউয়াল। কিছুদিন চট্টগ্রামে থাকার পর তিনি চলে আসেন সোনারগাঁও। এখানেই বিয়ে করেন তিনি। এক বছর পর তাঁর একটি ছেলে হয়। এ ছেলের নাম ছিল শেখ জহিরউদ্দিন।

এই শেখ জহিরউদ্দিনই বড় হয়ে চলে আসেন ফরিদপুরের গোয়ালন্দে। এখানে কুরসি গ্রামের পাশের গ্রামে বিয়ে করেন তিনি। তাঁর ছেলের নাম রাখা হয় শেখ জান মাহমুদ। তেকড়ি শেখ নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী ও ভদ্র।

অল্পদিনেই তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে জীবন যাপন করতেন। শেখ জান মাহমুদের ছেলে শেখ বোরহানউদ্দীন জীবিকা হিসেবে বেছে নেন ব্যবসা। ব্যবসার প্রয়োজনে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো তাঁকে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একবার তিনি আসেন টুঙ্গিপাড়ায়। এখানেই থেকে যান শেখ বোরহানউদ্দীন। টুঙ্গিপাড়ার কাজিবাড়ির এক মেয়েকে বিয়ে করেন তিনি। সংসার শুরু হয় তাঁর। শেখ বোরহানউদ্দীন ছিলেন তিন ছেলের জনক। তাঁর দ্বিতীয় ছেলের নাম ছিল শেখ আবদুল হামিদ। ইনিই ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের দাদা–শেখ লুৎফর রহমানের পিতা। অত্যন্ত ধার্মিক একজন মানুষ।

পিতা-মাতার ছয় সন্তানের ভেতর মুজিবের স্থান ছিল তৃতীয়। আর পুত্রদের ভেতর বড় ছিলেন তিনি। ছিলেন খুবই আদরের সবার চোখের মণি।

দরবেশ শেখ আউয়াল

(হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর (রা.) সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এলাকায় আগমন)

- শেখ জহিরউদ্দিন
  - শেখ জান মাহমুদ ওরফে তেকড়ি শেখ
    - শেখ বোরহানউদ্দিন
      - শেখ আকরাম
        - শেখ অছিমুদ্দিন
      - শেখ তাজ মাহমুদ
        - শেখ আব্দুল হামিদ
          - শেখ লুৎফর রহমান (মৃত ১৯৭৪ খ্রী.)
            - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (জন্ম ১৯২০ খ্রী. নিহত ১৯৭৫ খ্রী.)
              - শেখ হা সিনা
              - শেখ কামাল (নিহত ১৯৭৫ খ্রী.)
            - শেখ জামাল (নিহত ১৯৭৫ খ্রী.)
            - শেখ আবু নাসের (নিহত ১৯৭৫ খ্রী.)
              - শেখ রেহেনা
              - শেখ রাসেল (নিহত ১৯৭৫ খ্রী.)
      - শেখ কুদরতউল্লাহ্ ওরফে কদু শেখ
        - শেখ আব্দুর রহমান ওরফে নশু মিয়া

সূত্র : কাজী লতিফুর রহমান ও শাহ্জাহান বিন্ মোহাম্মদ



শিক্ষাজীবন শুরু

শিক্ষাজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। একবার পড়লেই সব তাঁর আয়ত্ত হয়ে যেতো। ছেলেবেলা থেকেই শেখ মুজিব ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের অধিকারী। তাঁর ছিল চমৎকার সাংগঠনিক শক্তি। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দল গঠনে উৎসাহের অন্ত ছিল না তাঁর। ছোটরা তাঁকে ডাকতো খোকা ভাই বলে। কারণ ওটাই ছিল তাঁর ডাক নাম। কে জানত সেদিনের সেই খোকা ভাই একদিন এতবড় হবে। বিশ্ব জুড়ে নাম ছড়িয়ে পড়বে।

ছেলেবেলায় গৃহশিক্ষকের কাছেই হাতেখড়ি হয় শেখ মুজিবের। তাঁর প্রথম শিক্ষকের নাম ছিলো পি ত শাখাওয়াত উল্লাহ্। যেমন মিষ্টভাষী ঠিক তেমনি গুণী শিক্ষক ছিলেন তিনি। ছাত্রদের সাথে বন্ধুর মতো মিশে কঠিন পড়াগুলোকে সহজ করে দিতে খুবই পটু ছিলেন তিনি। শেখ মুজিব ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র।

গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া শেষ হলে ১৯২৭ সালে তিনি ভর্তি হন গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানে অবশ্য খুব বেশিদিন পড়ার সুযোগ পাননি তিনি। কারণ এগারো বছরে পা দেয়ার পরপরই ১৯৩১ সালে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে যান মাদারিপুরে। সেখানেই সেরেস্তাদারের চাকরি করতেন তিনি। চাকরিতে তিনি ছিলেন খুবই দায়িত্বশীল।

বাবার চাকরির সুবাদে গ্রাম ছেড়ে তাঁকে চলে আসতে হয় মাদারিপুরে। এই মাদারিপুর শহরে ছিল ইসলামিয়া হাইস্কুল নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়। এই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়া হয় শেখ মুজিবকে। এখানে তিনি আক্রান্ত হন চোখের রোগে। এ রোগের কারণে চোখও নষ্ট হয়ে যায় তাঁর। পরে অবশ্য কলকাতা নিয়ে চোখের চিকিৎসা করানো হয়। চোখে চশমা দেয়া হয়।

মাদারিপুরেও বেশিদিন থাকা হয়ে ওঠে না শেখ মুজিবের। কারণ এরই মাঝে তাঁর পিতাকে বদলি করা হয়েছিল গোপালগঞ্জ। মাদারিপুরের পাট চুকিয়ে তাই মুজিবকে নিয়ে তিনি চলে আসেন গোপালগঞ্জে। এবার বাড়ির কাছাকাছি এলেন তিনি। সে সময় গোপালগঞ্জ শহরে খুব ভালো স্কুল ছিল না বললেই চলে। একটি স্কুল ছিল মাঝারি মানের গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল। সেই স্কুলেই ভর্তি করে দেয়া হয় শেখ মুজিবকে। এবার তিনি ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণীতে।



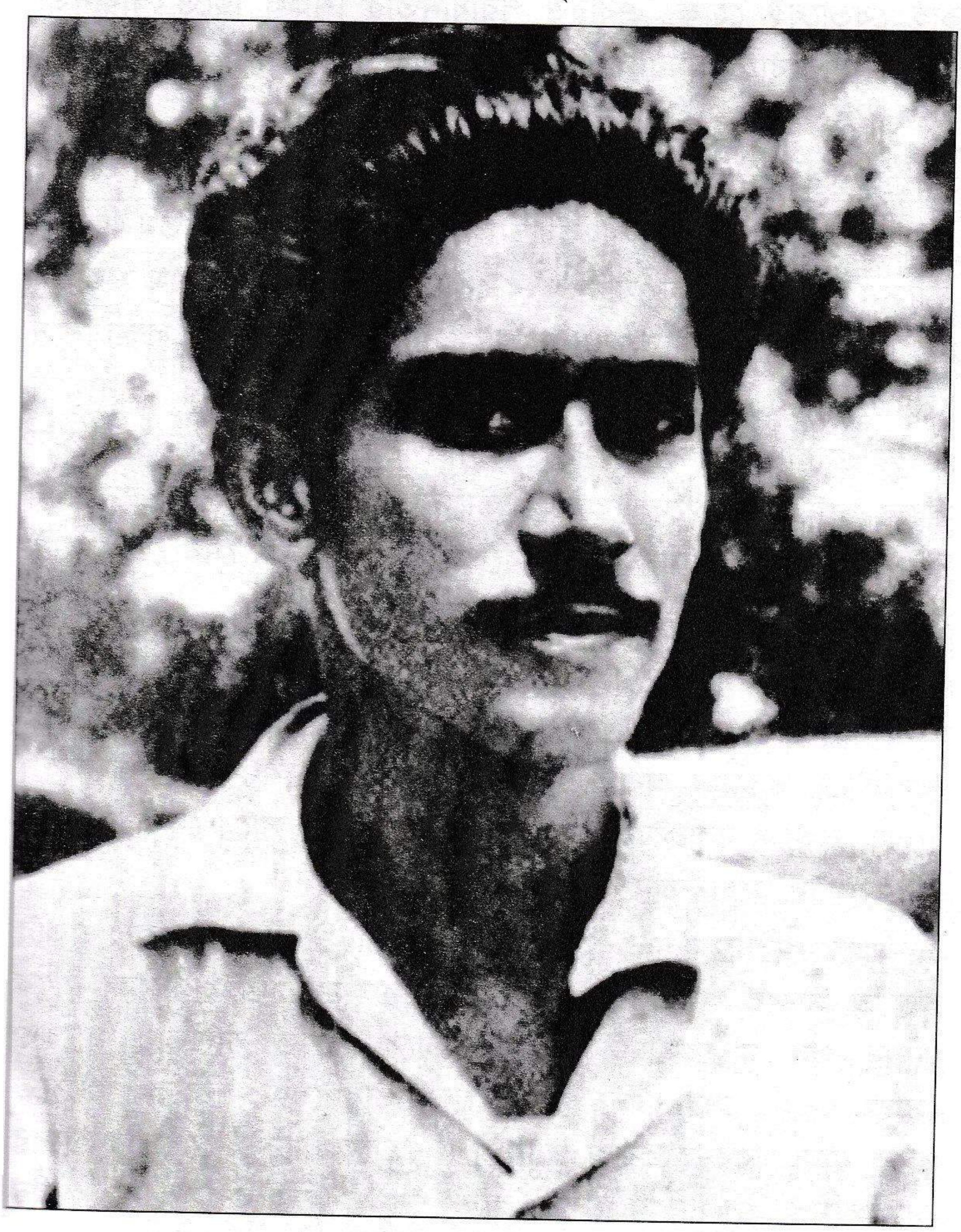
১৯৪০ সালে ফুটবলের ট্রফি হাতে কিশোর মুজিব

স্কুলটা চালাত মিশনারিজরা। এই মিশন হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম ছিল গিরিশ চন্দ্র। মানুষ হিসেবে খুবই সরল ও রসিক ছিলেন তিনি। মাঝেমধ্যেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো স্কুলে। তিনি নাটক লিখতেন সে সব অনুষ্ঠানের জন্যে–ছাত্ররা অভিনয় করত। গান লিখতেন–ছাত্ররা দল বেঁধে গান গাইত। অন্য স্কুলের ছেলেদের সাথে আয়োজন করা হতো ফুটবল নয় তো হা-ডু-ডু খেলার। শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করতেন সেসব খেলায়। অন্যান্যের চেয়ে ভালোই খেলতেন তিনি। আর এজন্যে স্কুলের বন্ধুরা দলপতি হিসেবে মেনেও নিয়েছিল তাঁকে। এভাবে সবার প্রিয় হন তিনি।

সকালের সূর্যের দিকে তাকালেই যেমন দিনটি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়, বালক মুজিবকে দেখেও তেমনি সবাই বুঝতে পেরেছিল ভবিষ্যতে তিনি দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবেন। কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যা সত্য বলে জানতেন, যা ন্যায় বলে বিশ্বাস করতেন, তার পক্ষে দাঁড়াতে কখনো ভয় পেতেন না তিনি। এ গুণটি বজায় ছিল তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তটি পর্যন্ত। এ জন্যেই তিনি নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন এই দেশকে।

শেখ মুজিব যখন ছোট ছিলেন তখন এই দেশ ছিল ইংরেজদের শাসনাধীন। দুর্দান্ত দাপটের সাথে এ দেশ শাসন করতো ইংরেজরা। এ দেশের মানুষকে তারা মনে করত জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম। কথায় কথায় গুলি করে মারত, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত, ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়ে ভিক্ষুক বানিয়ে ছাড়ত। এমনকি নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এ দেশের তাঁতিদের আঙুলও কেটে দিয়েছিল তারা! এত অত্যাচার করত যে, লিখে শেষ করা যাবে না। তাই ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এ দেশবাসী। সেই ইচ্ছে জন্ম নিয়েছিল মুজিবের ভেতরও। স্কুল-জীবনেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দেশবাসীকে স্বাধীন করতে না পারলে এ জাতির উন্নতি হবে না। শিক্ষার প্রসার হবে না। মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। আর তার চেয়েও বড় কথা, অন্যান্য জাতির সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। এ লজ্জা কোনো আত্মসম্মান সচেতন মানুষ মেনে নিতে পারে না। স্বাধীনতা অমূল্য ধন।

স্কুলের বন্ধুদের কাছে এসব কথা প্রায়ই খুলে বলতেন মুজিব। বলতেন, আজ আমরা পরাধীন। কিন্তু সব সময় আমরা পরাধীন থাকব না। আমাদের সোনালী ফসল আর সম্পদের লোভে পড়ে বারবার ভিনদেশী পররাজ্য লোভীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। ছলে বলে কৌশলে তারা দখল করে নিয়েছে আমাদের ছায়াঘেরা পাখি ডাকা নদীমাতৃক এই দেশ। একটি জাতির



১৯৪২ সালে ইসলামিয়া কলেজে পড়াকালীন সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান

জন্যে এরচেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? এই বোধটি সবার মাঝে জাগ্রত করলেন তিনি।

দুঃখকে মাথা পেতে নেয় তারাই, যাদের মাঝে রুখে দাঁড়াবার মতো শক্তি নেই– দুঃখকে জয় করার মতো সাহস নেই। কিন্তু আমরা তো তেমন জাতি নই! আমরা বাঙালি। আমরা স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। ভিন দেশীদের কাছ থেকে বারবার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা। তাই যেভাবেই হোক, এবারও পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবোই আমরা। এটাই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

১৯৩৯ সালে শেখ মুজিব যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, সে সময় উপমহাদেশ জুড়ে চলছিল ইংরেজ তাড়াবার আন্দোলন। এসব আন্দোলন যাঁরা পরিচালনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর শেরে বাংলা এ. কে. এম ফজলুল হক। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪০ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক আর খাদ্যমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী এসে হাজির হন গোপালগঞ্জে। এ কথা জানতে পেরে মুজিব ছুটে যান তাঁদের কাছে। তাঁদের প্রশ্ন করে করে জেনে নেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা–জেনে নেন ছোটরা কি করে এই আন্দোলনে শরীক হতে পারে সে কথাও।

শেখ মুজিবের প্রশ্নের গভীরতা দেখে বিস্মিত হন সোহ্‌রাওয়ার্দী। মনোযোগ দিয়ে তিনি শোনেন মুজিবের প্রতিটি কথা। তারপর রাজনীতির বর্তমান অবস্থা, মারপ্যাঁচ বুঝিয়ে দেন খুব সহজভাবে। বলেন, কখনো কলকাতা গেলে মুজিব যেন তাঁর সাথে দেখা করেন। এ ছেলেটির মধ্যে তিনি বিদ্রোহের আগুন দেখেন।

প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে চমৎকার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে মুজিবের। সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা ফিরে যাবার পর মুজিব চিঠি লেখেন তাঁকে। শত ব্যস্ততার মাঝেও সোহ্‌রাওয়ার্দী সেই চিঠির জবাব দেন তাঁর ছোট্ট ভক্তকে। চিঠিতে থাকে নানা খবর–হাজারো পরামর্শ। এভাবে ধীরে ধীরে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও সাহসী নেতা হতে শেখ মুজিবকে সাহায্য করেন সোহ্‌রাওয়ার্দী। দুজনের মধ্যে চলে ভাব বিনিময়।

শেখ মুজিবুর রহমান যখন গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলের ছাত্র তখনই তিনি তাঁর চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেসাকে বিয়ে করেন। ফজিলাতুন্নেসার ডাক নাম ছিল রেনু। মুজিবের বাবা-মাও ছিলেন চাচাতো ভাই চাচাতো বোন রেনুর মা মারা গেলে শাশুড়িই তাঁকে মানুষ করেন।

১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা (ম্যাট্রিক সমমান) পরীক্ষায় পাস করেন শেখ মুজিব। তারপর চলে যান কলকাতা। সেখানে গিয়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন তিনি। আস্তে আস্তে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই অপরের দুঃখে দুঃখিত হবার, অপরের অভাব মোচন করার মানসিকতা লক্ষ করা গিয়েছিল মুজিবের মাঝে। একেবারে ছোট সময় টুঙ্গিপাড়ায় তিনি তাই করেছেন। গোপালগঞ্জে স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তাদের নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গরিব-দুঃখিদের পাশে। কলকাতায় অগণিত মানুষ। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সংখ্যাও বেশি। তাই এখানে সমস্যা জর্জরিত মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সুযোগও ছিল বেশি। কলকাতায় পা দিয়ে তিনি লুফে নেন সেই সুযোগ। নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠনের সাথে। তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় গড়ে ওঠে 'মুসলিম সেবক সমিতি'। এ সমিতির সদস্যরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাল-ডাল সংগ্রহ করে তা বিলিয়ে দিত অভাবী মানুষদের মাঝে। কখনো তারা সংগ্রহ করত পুরনো কাপড় আর বইপত্র। এসব বণ্টন করা হতো গরিব ছাত্রদের মাঝে। তিনি পরোপকারী বলে সব সময় প্রমাণিত হয়েছেন।

সে সময় কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের থাকার জন্যে মাত্র দুটো ছাত্রাবাস ছিল। একটি ছিল ধর্মতলা স্ট্রিটে–নাম বেকার হোস্টেল। অন্যটি কারমাইকেল হোস্টেল। শেখ মুজিব থাকতেন বেকার হোস্টেলে। কারণ সাধারণ মুসলিম ছাত্রদের আবাসস্থল ছিল এটা।

তখন মুসলমান সমাজে সবেমাত্র পরিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পরিবর্তনের হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল মুসলমান ছাত্রদের মাঝেও। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা।

তাই মুসলিম ছাত্রবাস দুটোতে বিরামহীনভাবে চলত রাজনৈতিক আলোচনা। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড লেগেই থাকত সেখানে। শেখ মুজিব তো এমন পরিবেশই কামনা করেছিলেন মনে মনে। সুতরাং কলকাতা এসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে একটুও দেরি হয়নি তাঁর। আর সবার ওপর দীক্ষাগুরু সোহ্‌রাওয়ার্দী তো ছিলেনই। তিনি তাঁকে রাজনীতি শেখাতেন।

ভারতের কংগ্রেসের নাম জানে সবাই। সে সময় সমগ্র ভারতে কংগ্রেস দলের ছিল খুব নাম-ডাক। অনেক মুসলমান ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য। এমনকি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ও একসময় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, কংগ্রেস কখনো মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে একটি কথাও বলেনি! তারা নিজেদের স্বার্থই দেখত।

কংগ্রেস কখনো মুসলমানদের কথা বলবে না–এই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে গঠিত হয়েছিল একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন–'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। সে সময়কার বড় বড় সব নেতারাই ছিলেন মুসলিম লীগের সদস্য। শেখ মুজিবুর রহমানও যোগ দেন মুসলিম লীগে। চালিয়ে যেতে থাকেন সভা-মিছিল। প্রথম সারির নেতাদের সাথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন শহর থেকে গ্রামে–গ্রাম থেকে শহরে। ফলে নেতাদের সাথে



১৯৪৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান

তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ঠিকই, কিন্তু লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়েন তিনি। রাজনীতিই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। মানুষের মুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি।

একবার ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে যাবার কথা ছিল খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে। তিনি তখন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। খুব নাম-ডাক ছিল তাঁর।

রাত আটটার সময় ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা শেষ হলে মিছিল নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, এ মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন কে? ছাত্র মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। তার ওপর পুলিশের খাতায় নাম উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা তো ছিলই। তাই নেতৃত্ব করার জন্যে পাওয়া যাচ্ছিল না কাউকেই। চিন্তিত সবাই। কে যাবে? কে যাবে?

এমন সময় শেখ মুজিব মিছিলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, মিছিলটি কে নেতৃত্ব দেবে, এ নিয়ে এত দ্বিধায় ভোগার কোনো মানে হয় না। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকারের কথা জানাতে যাচ্ছি আমাদেরই প্রধানমন্ত্রীকে। এটা তো কোনো আইন বিরোধী কাজ নয়। সুতরাং ভয় পাবারও কিছু নেই। কারো যদি কোনো আপত্তি না থাকে তবে আমিই দেবো এ মিছিলের নেতৃত্ব।

অবশেষে তাই হলো। নির্ভীক মুজিবের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন ছাত্রের সেই মিছিল গিয়ে পৌঁছল প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে। তাদেরকে ডেকে নিয়ে বসানো হলো সুসজ্জিত বৈঠকখানায়। শেখ মুজিব কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলেন অটল প্রহরীর মত। তাঁর এক কথা–দাবি আদায় না হলে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে বসবেন না তিনি। এক কথা এক দাবি।

খাজা নাজিমুদ্দীন ঘরে ঢুকেই জানতে চাইলেন রাতের বেলা মিছিল নিয়ে তাঁর বাড়িতে আসার কি উদ্দেশ্য? কে দিল এ দুঃসাহস।

এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাহসই হলো না কারও। সবাই মুখ নিচু করে বসে রইল। শেখ মুজিব তখন বললেন তাঁদের দাবি-দাওয়ার কথা। সব শুনে তুখোড় রাজনীতিক নাজিমুদ্দীন বললেন, আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সমস্যার সমাধান করতে। এখন নিজ নিজ হোস্টেলে ফিরে যাও।

মুজিব বললেন, আপনারা তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না। নেতাদের কাছে মুসলমান ছাত্ররা শুধু বারবার প্রতিশ্রুতিই পেয়ে আসছে–সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমরা কি করে বুঝবো আপনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন?

শেখ মুজিবের এই নির্ভীক ও স্পষ্ট অভিযোগ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। অবাক চোখে তিনি তাকিয়ে থাকলেন মুজিবের দিকে। আর এ ছেলেটির ভবিষ্যৎ যেন দিব্য চোখে দেখলেন তিনি।

পথে নেমে সিদ্ধান্ত হলো এবার মিছিল নিয়ে যাওয়া হবে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর কাছে। তাঁকেই জানানো হবে ছাত্রদের সমস্যার কথা।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীও ছিলেন ঝানু রাজনীতিবিদ। তিনিও মিষ্টি কথায় মিছিলকারীদের বিদায় করে দিলেন তাঁর বাসভবন থেকে। শেখ মুজিব বুঝতে পারলেন, এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। আন্দোলন চালাতে হবে আরো শক্ত হাতে–তীব্রতর করে।

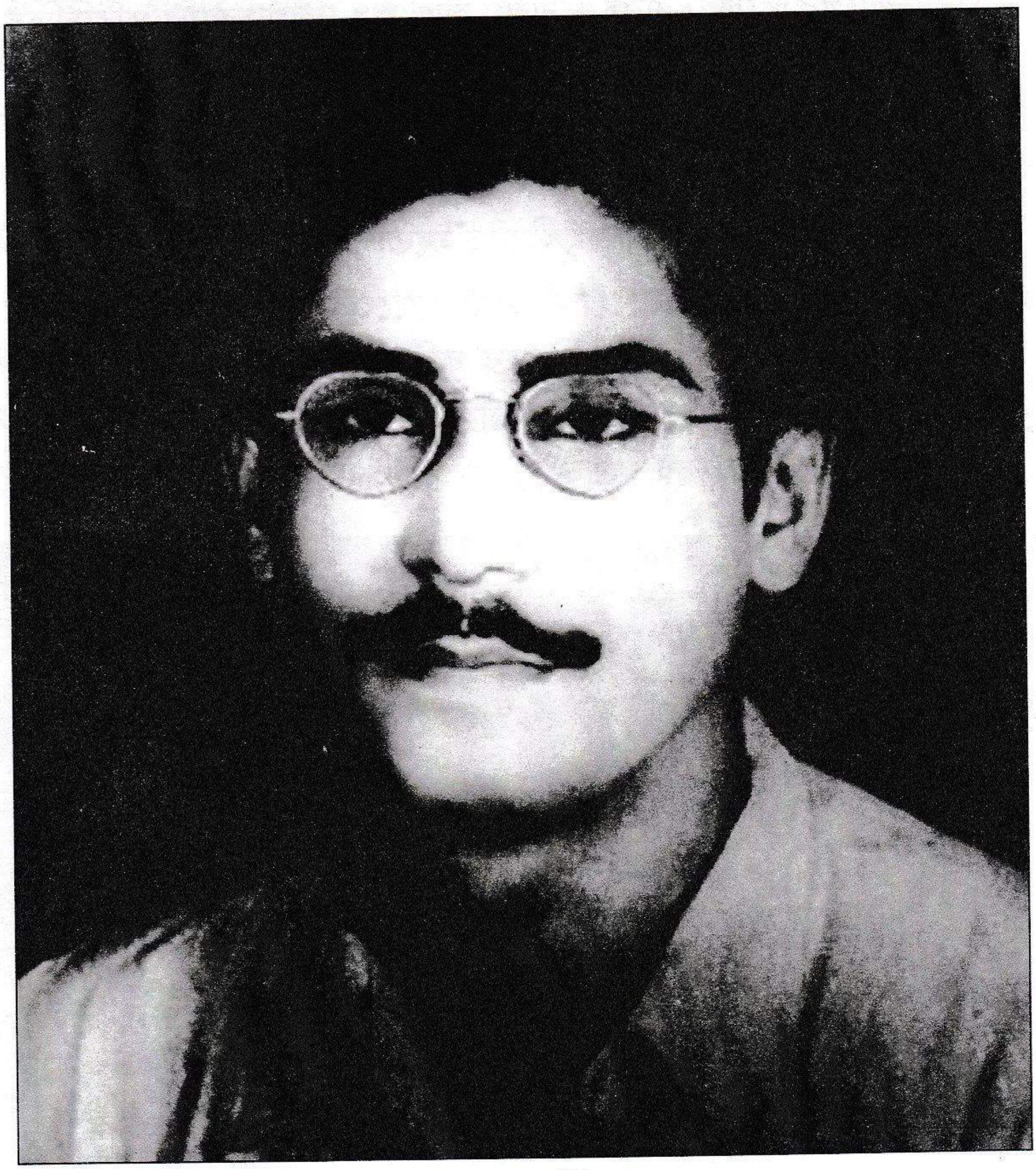
এজন্যে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন।

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ফজলুল কাদের চৌধুরীর তখন খুব নাম-ডাক ছিল ছাত্রনেতা হিসেবে। তিনি তখন আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়ছিলেন। থাকতেন কারমাইকেল হোস্টেলে। শেখ মুজিব সোজা চলে যান তাঁর কাছে। তাঁকে খুলে বলেন সব কথা। আর ফজলুল কাদের চৌধুরীকে অনুরোধ করেন আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্যে।

প্রথম দিকে অসম্মত হলেও মুজিবুবের অনুরোধ মেনে নেন ফজলুল কাদের চৌধুরী। তাঁর নেতৃত্বে সত্যি সত্যিই ছাত্রদের আন্দোলন জোরালো হয়ে ওঠে। আর বাধ্য হয় সরকার ছাত্রদের দাবি মেনে নিতে।

শেখ মুজিব ছিলেন আপন আদর্শের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কোনো লোভ বা ভয়-ভীতিই আদর্শ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি।

ইসলামিয়া কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন শেখ মুজিব ছিলেন ফরিদপুর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক। আর সভাপতি ছিলেন কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান। তিনি প্রস্তাব করলেন সমিতির পক্ষ থেকে বাংলার নতুন গভর্নরকে সংবর্ধনা জানাতে হবে। কিন্তু মুজিব বললেন, অসম্ভব। এ হতেই পারে না। আমরা চাইছি ইংরেজ শাসনের অবসান। আমরা চাইছি এদেশ থেকে তাদেরকে চিরতরে তাড়িয়ে দিতে। সেখানে কি করে তাদেরকে সংবর্ধনা দেব? এটা ভারতবাসীদের জন্যে একটা অপমানজনক অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে–আর আমাদের জন্যে হবে হঠকারী সিদ্ধান্ত।



তরুণ বয়সে শেখ মুজিবুর রহমান

লতিফুর রহমানও ছিলেন দেশদরদী রাজনৈতিক নেতা। শেখ মুজিবের দৃঢ়তা আর সুচিন্তিত মতামত শুনে সেদিন আনন্দে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর বললেন, সত্যি, এমন গভীর করে ভেবে দেখিনি আমি। তোমার কথাই সত্যি।

১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরামর্শে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে ফরিদপুর যান শেখ মুজিব। এটা ছিল সাধারণ মানুষের সাথে পরিচিত হবার এক চমৎকার সুযোগ। মুজিবুর রহমানও খুব দক্ষতার সাথে কাজে লাগান সেই সুযোগ। ফরিদপুর জেলার প্রতিটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে, পথে-প্রান্তরে ছুটে ছুটে প্রচারণা চালিয়ে যান মুসলিম লীগের পক্ষে। এতে মুসলিম লীগ শুধু দলগতভাবে পরিচিতিই লাভ করে না–মুজিব নিজেও হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষদের কাছের মানুষ। গ্রাম-গঞ্জের খেটে-খাওয়া মানুষদের সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান শেরে বাংলা ফজলুল হক আর নাজিমুদ্দীনের মতো জাঁদরেল নেতারাও।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রথম থেকেই নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন শেখ মুজিবকে। মুজিবের ফরিদপুর প্রচারণার পর দুজনার সম্পর্ক হয়ে ওঠে আরো অন্তরঙ্গ–আরো নিবিড়। একজন অন্যজনার হয়ে ওঠেন আরো কাছের মানুষ।

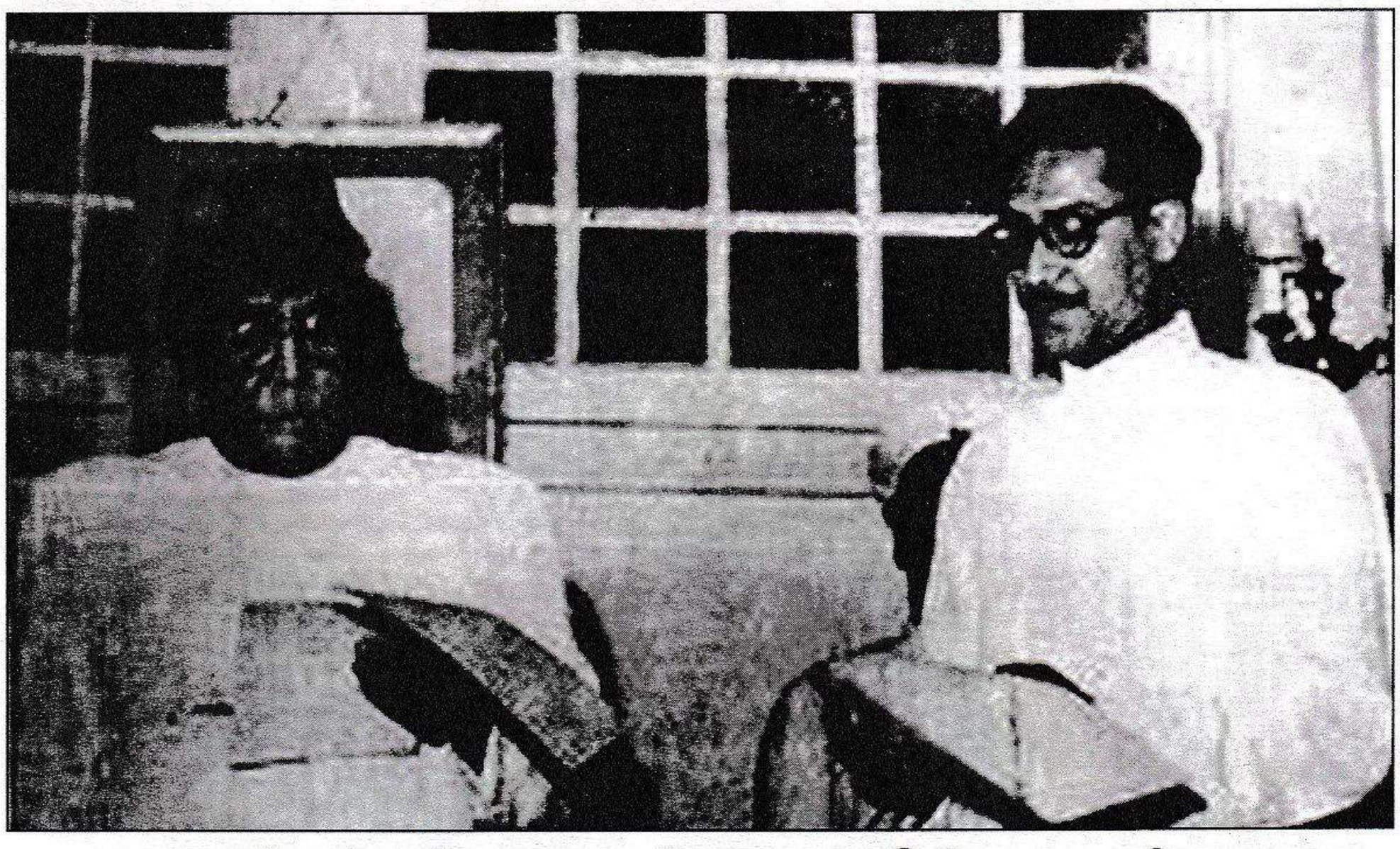


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী কর্মকাণ্ড

১৯৪৭ সালটি বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আসে শেখ মুজিবের জীবনে। এ বছর ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন তিনি। তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

প্রায় আড়াইশ বছর রাজত্ব করার পর এ বছরই ভারত ছেড়ে চলে যায় ইংরেজরা। বিশাল এই উপমহাদেশ ভাগ হয়ে জন্ম নেয় দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র–পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান। সে সময়কার পূর্ব বাংলা, যা বর্তমানে বাংলাদেশ–তা পড়ে পাকিস্তানের ভাগে। ১৯৫৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান।

১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কলকাতায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিমা নেতারা যখন নিজেদের খেয়ালখুশি মতো দেশ চালাতে থাকেন বাঙালি নেতাদের সাথে তখন প্রতিবাদে মুখর হন শেখ মুজিব। এ সময়



১৯৫৪ সালে যুক্তিফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন। শপথ পাঠ করাচ্ছেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে এক ছাত্রসমাবেশে তিনি বলেন, আমরা পাকিস্তান পেয়েছি। কিন্তু আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতার সাথে এ স্বাধীনতার কোনো মিল নেই। আর এজন্যে হয়ত পূর্ব বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে হবে আমাদের।

মুজিবের ভাষণ শুনে অবাক হলো সবাই। কলকাতায় এটিই ছিল ছাত্রসমাবেশে মুজিবের শেষ ভাষণ। তারপরই তিনি আইনশাস্ত্র পড়ার জন্যে ঢাকা এসে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনকার সেরা বিদ্যাপীঠ ছিল এটি।

ঢাকা এসে মুজিব ওঠেন ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে। তিনি দেখতে পান এরই মাঝে এখানকার রাজনৈতিক আকাশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল–পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক লীগ। কলকাতা থেকে চলে আসা অনেক নেতা-কর্মীই সদস্য হয়েছেন এ দলের। নতুন দল। নতুন চিন্তা-ভাবনা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই অন্যায় আচরণ শুরু হয়েছিল বাঙালিদের সাথে। প্রতিদিনই একটা না একটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল তখন। তবে সবচে বড় হয়ে বাঙালিদের সামনে দেখা দেয় ভাষার প্রশ্নটি। যেহেতু পাকিস্তানের লোকসংখ্যার দিক থেকে বাঙালিদের সংখ্যাই ছিল বেশি, তাই বাঙালিদের একটা আশা ছিল বাংলা ভাষা করা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কারণ এ ভাষা আমাদের মায়ের ভাষা। এটা বাঙালিদের প্রাণের দাবি।

১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয় খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারি বাসভবনে (বর্তমানে বাংলা একাডেমি ভবন)। সেখানে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এ প্রদেশে উর্দুকে সরকারি ভাষা করা হবে না। তাছাড়া বাংলা ভাষা যাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেতে পারে, সে ব্যাপারে জোরালো প্রচেষ্টা চালানো হবে। এটা যেন বাঁচার দাবি।

ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল তারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে। কিন্তু এসব কথা তেমন জোরালোভাবে

তখনো শোনা যায়নি। জোরালোভাবে শোনা গেল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মুখ থেকে। ১৯৪৮ সালে ২১ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা সভায় জিন্নাহ্ বললেন–"উর্দু! শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।"

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র এই ঘোষণা বাঙালি জাতিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শেখ মুজিব বলেন, অসম্ভব! এ অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া যায় না। যে কোনো মূল্যে



১৯৫৪ সালে রাজশাহী সফরে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। এরপরে চলল ভাষার জন্য সংগ্রাম, আন্দোলন।

চারদিকের প্রতিবাদ-বিক্ষোভেও কিন্তু ভড়কালেন না জিন্নাহ্ সাহেব। পরদিন জিন্নাহ্র সম্মানে কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক সমাবর্তন সভায় জিন্নাহ্ বললেন, "আমি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আবার বলছি। এই প্রদেশের সরকারি কাজের জন্যে এই প্রদেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো যে কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারে।... কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একটি ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে 'উর্দু অন্য কোনো ভাষা নয়।... উর্দু একমাত্র ভাষা যা উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। যা পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং তার চেয়েও বড় কথা যার মধ্যে অন্য যে কোনো প্রাদেশিক ভাষার থেকে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাস্তব রূপ লাভ করেছে–যে ভাষা অন্যান্য ইসলামী দেশে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।'

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র বক্তব্য চলতে থাকা অবস্থাতেই বিপুল ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্ররা। চিৎকার করে বলতে থাকে—না না না। আমরা মানি না, মানবো না এ কথা। বাংলাকেই করতে হবে রাষ্ট্রভাষা।

সেদিন শেখ মুজিব, কমরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাশেম, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ এবং শামসুল হকের মতো সাহসী নেতৃবৃন্দ একজোট হয়ে মাঠে নামেন ভাষার প্রশ্নে। ফলে পূর্ব বাংলা সরকারের নির্দেশে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সচিবালয়ের সামনে থেকে শেখ মুজিবসহ আরো পঁয়ষট্টিজনকে বন্দি করা হয় কারাগারে।



বঙ্গবন্ধুর জীবনে প্রথম জেল

১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের বাসভবনের সামনে কারারুদ্ধ ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবিতে এক বিশাল মিছিল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। তখন বাধ্য হয়েই সরকার সবাইকে মুক্তি দেয়– মুক্তি পান শেখ মুজিবও। আরো জনপ্রিয়তা বাড়ে তাঁর।

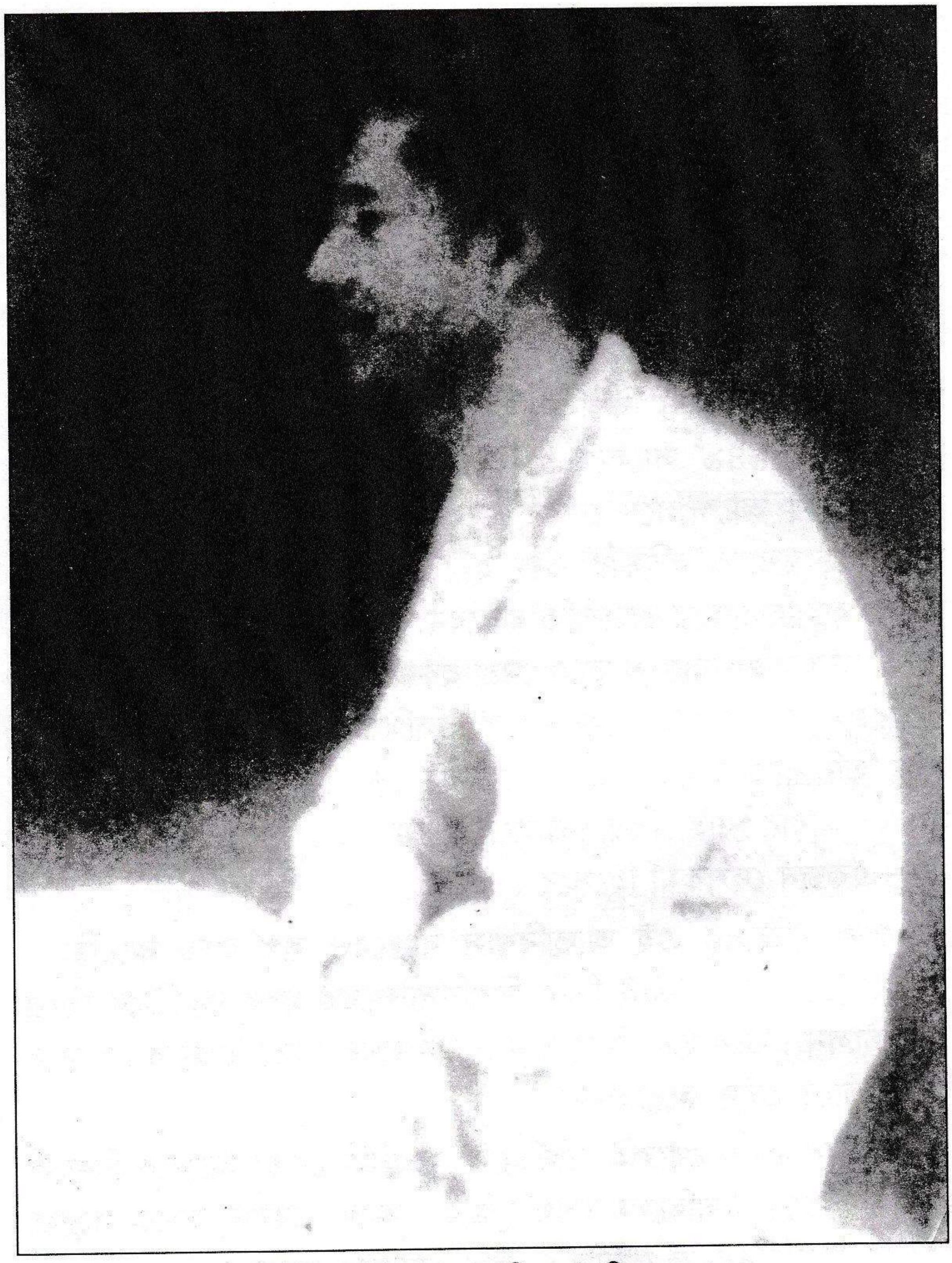
কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর নতুন করে দেশ সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন শেখ মুজিব। এরই মাঝে পরপর দুবার তাঁর ওপর আঘাত আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। প্রথমবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। দ্বিতীয়বার ১৯৪৯ সালের ৩১ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে চৌদ্দজন ছাত্রের সাথে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছিল আর রাজনীতি করবেন না বলে মুজিব যদি প্রতিশ্রুতি দেন, তবে বহিষ্কারাদেশ তুলে নেয়া হবে তাঁর ওপর থেকে। অভিযুক্ত পনেরজন ছাত্রের ভেতর চৌদ্দজনই লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি এ প্রস্তাব মেনে নিতে। তিনি বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব আবার এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আসবে। তবে ছাত্র হিসেবে নয়—একজন দেশকর্মী হিসেবে।'

শেখ মুজিবের এই আত্মবিশ্বাস বাস্তবেও রূপ লাভ করেছিল। আড়াই বছর পর সত্যিই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ফিরে এসেছিলেন। তবে ছাত্র হিসেবে নয়–জনগণের নেতা হিসেবে। স্বাদরে সবাই তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন।

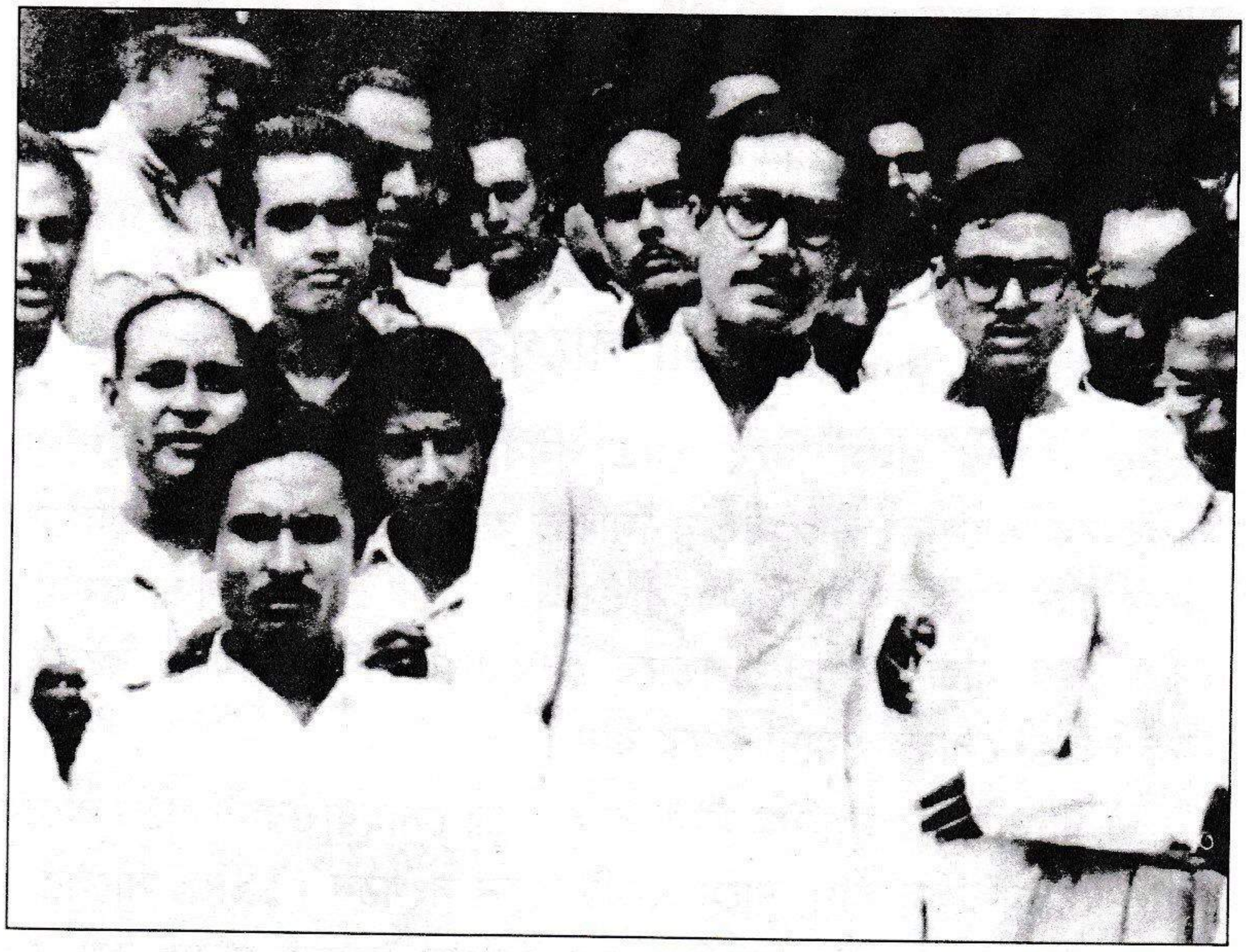
এভাবে প্রথম থেকেই স্বার্থত্যাগী সংগ্রামী নেতা হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছিলেন শেখ মুজিব। ফলে বারবার তাঁকে পড়তে হচ্ছিল শাসকদের কু-দৃষ্টিতে। তাঁর ছেচল্লিশ বছর বয়সের ভেতর

বারো বছরই জেলে কাটাতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুজিব বলেছিলেন, 'জেলখানা আমার দ্বিতীয় বাড়ি।'

বলেছেন, জেলখানার ছোট্ট সেলে বসে নিজেকে কখনো নিঃসঙ্গ মনে হয়নি। তাঁর মনে হয়েছে, এ দেশের লক্ষ কোটি জনগণ রয়েছে তাঁর পাশে। তাদের ভালোবাসার জোরেই একদিন মুক্তি পাবেন তিনি। আদায় করবেন অধিকার।



১৯৫১ সালে কারাগারে রাজবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৬২ সাল : জেল থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমান

জেলখানার দিনগুলোতে শেখ মুজিবের স্মৃতিপটে ভেসে উঠতো ফেলে আসা জীবনের ছবি। মনে পড়তো তাঁর বাবা-মা, ভাইবোন আর ছেলেবেলার খেলার সাথীদের কথা। গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলের শিক্ষক মহিম বাবুর কথা মনে পড়তো একটি বিশেষ কারণে। এই মহিম বাবু মাঝেমধ্যেই একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন ক্লাসের ছাত্রদের–ইংরেজ কবি রিচার্ড লাভলেইসের কবিতা। সেই কবিতায় কবি বলেছেন, পাথর ঘেরা দেয়াল হলেই কারাগার হয় না। লৌহশলাকা হলেই খাঁচা বানানো যায় না। যে মন সব সময়ই থাকে শান্ত ও নিষ্পাপ, কারাগার তার কাছে ঋষির আশ্রমের মতো মনোরম। এ ছিল তাঁর চেতনা।

ছেলেবেলায় এ কবিতার অর্থ তেমনভাবে বুঝতে পারেননি শেখ মুজিব। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বুঝেছিলেন, কবি লাভলেইসের কথাই সত্য। যাদের হৃদয় নিষ্পাপ, কারাগার তাদের কাছে উপাসনালয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তো জীবনের বেশি সময় কারাগারে কেটেছে তাঁর।



আওয়ামী লীগের জন্ম

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে নেতা নির্বাচনের প্রয়োজনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা এক সভায় মিলিত হন। এ সভায় নেতৃত্বদানের জন্যে খাজা নাজিমুদ্দীন ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর মাঝে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সমর্থন করেন। কিন্তু ভোটে সোহ্‌রাওয়ার্দী হেরে যান।

এ ঘটনার পর মুসলিম লীগ ত্যাগ করে সোহ্‌রাওয়ার্দী গঠন করেন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন সংগঠন। ১৯৪৯ সালের ৩ জুন স্বামীবাগের রোজ গার্ডেনে এক গোপন বৈঠকে গঠিত হয় এই নতুন সংগঠন। তবে ২৩ জুন একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের সভাপতি নির্বাচন করা হয় মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে। সহ-সভাপতি মনোনীত হন আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান ও আবুল মনসুর আহমেদ। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয় টাঙ্গাইলের শামসুল হককে। শেখ মুজিব তখন ছিলেন কারাগারে। তাঁকে করা হয় সহ-সাধারণ সম্পাদক। এই একই পদে খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও রফিকুল হোসেনও মনোনীত হন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলার প্রতি চরম অবহেলা দেখাতে থাকেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা। ১৯৪৯ সালে এখানে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৯৫০ সালে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করলে আওয়ামী লীগ এক ভুখা মিছিলের আয়োজন করে। আরমানীটোলা ময়দান থেকে মিছিল এগোয় খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনের দিকে। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু মিছিল নাজিরা বাজারের সামনে পৌঁছুলে পুলিশ আচমকা মিছিলের ওপর গুলি চালায়। এখানে

দুই ভুখা ব্যক্তি প্রাণ হারায়। আর শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয় ভাসানী, শামসুল হক ও শেখ মুজিবকে। অবশ্য এ যাত্রা মাত্র কয়েকদিন বন্দি থাকতে হয় তাঁদেরকে। তারপরই মুক্তি পেয়ে যান তাঁরা। কিন্তু সংগ্রাম থেমে থাকে না।

বন্দি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগ নেতারা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েন। জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন আওয়ামী মুসলিম লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আওয়ামী মুসলিম লীগ স্বীকৃতি পায় একটি শক্তিশালী দল হিসেবে।

এ দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় সরকারবিরোধী প্রবল আন্দোলন। ফলে পতন ঘটে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার। গঠিত হয় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা। শেখ মুজিবুর রহমানকেও স্থান দেয়া হয় মন্ত্রিসভায়। তবে কিছুদিন পর মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে দল পুনর্গঠনে নিয়োজিত হন তিনি। মন্ত্রিত্ব থেকে তাঁর কাছে দল বড়।



১৯৫২ সাল : আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে শেখ মুজিব

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালে খাজা নাজিমুদ্দীনকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা সফরে এসে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি আবার তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষেই বক্তব্য রাখেন। ফলে আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এদেশের মানুষ। আবার শুরু হয় মিছিল-মিটিং, সভা-সমিতি। বাঙালিরা দাবি তোলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'–'বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই'। এটা ছিল গণমানুষের দাবি।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে হবার কথা ছিল পূর্ব বাংলা সরকারের বাজেট অধিবেশন। তাই এ দিনটি থেকে পুরো এক মাস ঢাকা শহরে জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। ছাত্র-জনতা তা উপেক্ষা করেই মিছিল বের করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের (বর্তমানের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) আমতলা থেকে দশজন দশজন করে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল বের হয় পথে। অমনি পুলিশও গুলি চালায় এলোপাথাড়ি ভাবে। এতে নিহত হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো কয়েকজন। বন্দি করা হয় কয়েকশ' ছাত্র-জনতাকে। শেখ মুজিব অবশ্য এ সময় কারাগারেই ছিলেন। তবে ২১ ফেব্রুয়ারির গুলির প্রতিবাদে অন্যান্যের সাথে সেখানে অনশন করেন মুজিব। ফলে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়া হয় তাঁকে।

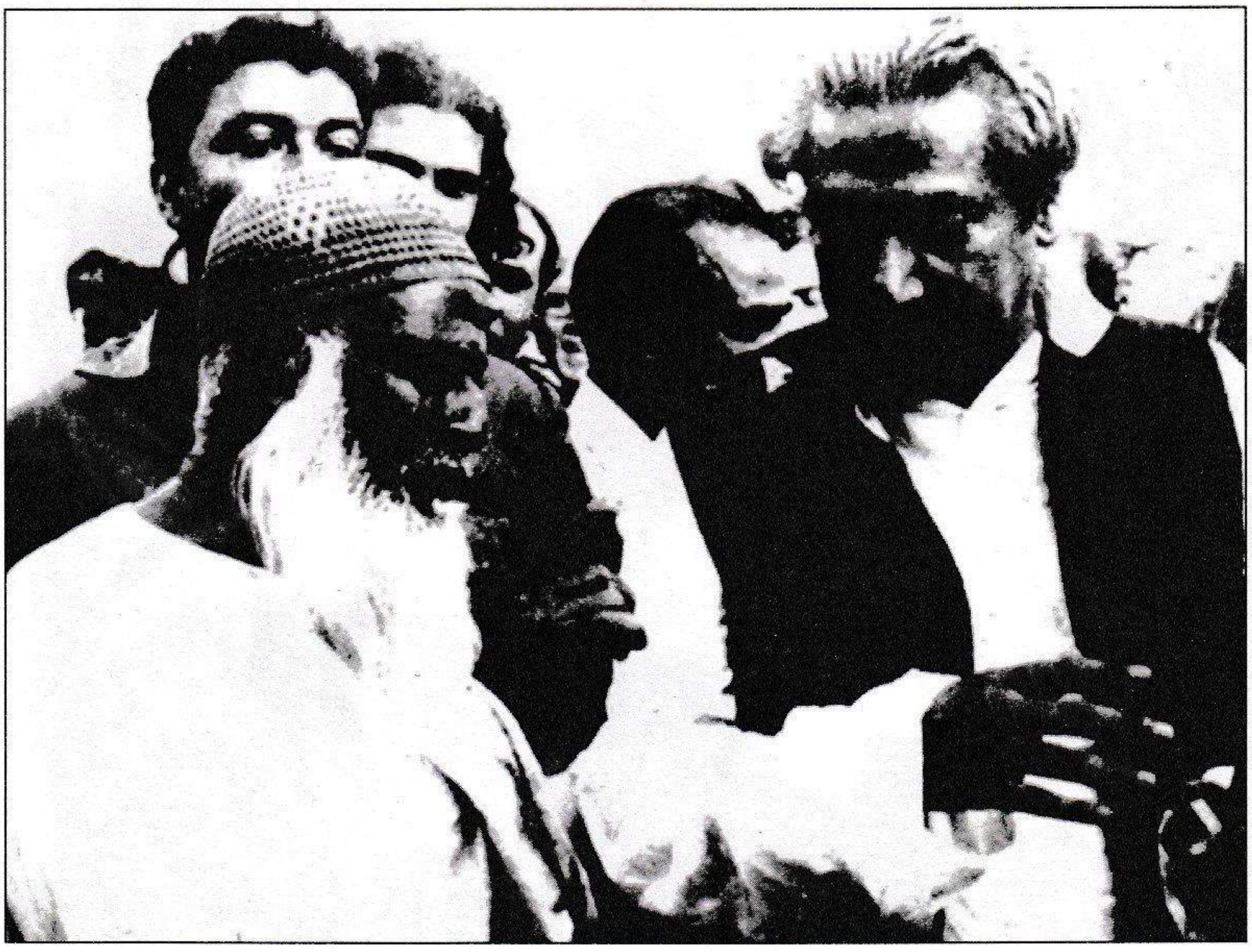
১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। এই একই অধিবেশনে শামসুল হককে সরিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। ভাসানী অবশ্য সভাপতি পদেই বহাল থাকেন। নতুন কার্যক্রম শুরু হয় তাঁর।

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ শুধুমাত্র পূর্ব বাংলার জন্যে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের অংশীদার দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের সময় একুশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। শেখ মুজিব প্রার্থী হন গোপালগঞ্জ থেকে। এ নির্বাচনে তিনি ১৩

হাজার ভোটের ব্যবধানে কোটিপতি প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৩৭টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। অবশিষ্ট আসনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্টের সদস্যরা। এর ভেতর ১৪৩টি আসনই পেয়েছিল আওয়ামী লীগ। এটা ছিল একটা বড় ধরনের বিজয়।

মুসলিম লীগের ভরাডুবির পর ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ১৫ মে শেখ মুজিবকে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বন সম্পদ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রথম থেকেই মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণের স্বীকার হতে থাকে। তাদেরই উস্কানিতে ঢাকা কারাগার, আদমজী জুট মিল এবং আরো কয়েকটি স্থানে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা বাধে। এ দাঙ্গা দমন করা হলেও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অযোগ্য–এই অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে। পূর্ব বাংলায় জারি করা হয় ৯২-ক ধারা। প্রবর্তন চাপিয়ে দেয়া হয় গভর্নরের শাসন। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল হককে



মওলানা ভাসানীর সাথে একান্ত আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে মওলানা ভাসানীসহ শেখ মুজিব

করা হয় গৃহবন্দি। পূর্ব বাংলার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। তবে ২৩ ডিসেম্বর শেখ মুজিব মুক্তি পান। এরপর ১৯৫৫ সালের ৩ জুলাই ৯২-ক ধারা রদ করে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। এবারও শেখ মুজিব পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। এতে তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন–ইস্কান্দার মির্জা হন প্রেসিডেন্ট। এ সময় মুজিবের নেতৃত্বে ৫ মে ঢাকায় দু মাইল দীর্ঘ একটি ভুখা মিছিল বের হয়। চকবাজারের কাছে মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে মারা যায় তিন মিছিলকারী। ঢাকা শহরে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। রাজনৈতিক আবহাওয়া হয় উত্তপ্ত।

এ ঘটনার রেশ ধরে ক্ষমতাসীন আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগে বাধ্য হয়। ফলে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। শুরু হয় কার্যক্রম।

১৯৫৬ সালে সংবিধানে পরিবর্তন এনে পূর্ব বাংলার নতুন নাম রাখা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান'। এদিকে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা রাজধানীতে বসে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর এজেন্টদের মাধ্যমে আওয়ামী লীগে ভাঙনের সূচনা করেন। সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে পাক-মার্কিন চুক্তির প্রশ্নে ভাসানীর সাথে মতবিরোধের সৃষ্টি হলে ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। এ সময় আওয়ামী লীগ থেকে অলি আহাদকে বহিষ্কার করা হয়। এর প্রতিবাদে ৯ জন আওয়ামী লীগ সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৫৭ সালের ১২ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। চারদিকে সৃষ্টি হয় একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশ।



ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। মূলত ভাষা-বিতর্ক নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।[১] পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যায় শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে সম্মত ছিল না। তারা চেয়েছে একমাত্র উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা। বাংলাকে পাস্তিানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার বাঙালিদের দাবি ছিল খুবই ন্যায়সঙ্গত।

ভাষা-আন্দোলনের দু'টি পর্ব ছিল। প্রথম পর্ব, ১৯৪৮ সাল। দ্বিতীয় বা সর্বোচ্চ পর্ব, ১৯৫২ সাল। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে ভাষা-আন্দালনের উভয় পর্ব, আন্দোলনের সূচনা ও বিস্তার, কার কী ভূমিকা, ১১ই মার্চ (১৯৪৮) ও ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩)-র ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা, সরকারের অবস্থান, নিজের ভূমিকা ইত্যাদি বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্থান পেয়েছে (আত্মজীবনী, পৃ. ৯১-১০০, ১৯৬-২০৭)। এতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু উভয় পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পেছন ফিরে দেখা যাক। ১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্টভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি উত্থাপন করেন। এর সূত্রধরে সংগঠনগতভাবে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বাধীন তমুদ্দুন মজলিস ভাষা-আন্দোলনের সূচনা করে। এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ যুক্ত হয়। গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ'। ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয়। ঐ দিন পূর্ব পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট (ইডেন বিল্ডিং)-এর সামনে পিকেটিং করা অবস্থায় অন্যানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে

গ্রেপ্তার করা হয়। পাঁচদিন তাঁকে জেলে কাটাতে হয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ভাষা-আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের একজন। ১৫০ নম্বর মোগলটুলী পার্টি হাউজের প্রধান সংগঠক ও পরে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকও একই দিনে গ্রেপ্তার হন এবং তারা ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে একই ওয়ার্ডে ছিলেন্ বঙ্গবন্ধু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেন:

আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচদিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে শ্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা এতটুকু ক্লান্ত হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'–নানা ধরনের শ্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, "হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।" হক সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব (আত্মজীবনী, পৃ.৯৪-৯৫)।

জেল থেকে মুক্তি লাভের পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই মার্চ (১৯৪৮) আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সম্মুখ চত্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সভায় বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্ব করা, পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বিলির সদস্যদের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ধরে এনে ছাত্রদের জোর করে তাদের নিকট থেকে পদত্যাগের অঙ্গীকার লিখিয়ে নেয়ার চেষ্টা, রেসকোর্সের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভায় (২১ শে মার্চ ১৯৪৮) জিন্নাহর 'উদুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'– এই ঘোষণার সময় উপস্থিত ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ এবং মাঠের যে স্থান থেকে ছাত্রদের প্রতিবাদ উঠেছিল, সেখানে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিত থাকা ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনাও আত্মজীবনীতে রয়েছে।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন 'উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' করার ঘোষণা দিলে ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। সে সময়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে কারাবন্দি। বন্দি

অবস্থায়ও তিনি আন্দোলনে দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করেন। সে সময়ে চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে, সেখান থেকে কিভাবে তিনি ছাত্রলীগ ও আন্দোলনের অন্য কর্মীদের নির্দেশনা দেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপ–

... আমি হাসপাতলে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে। দরজার বাইরে আইবিরা পাহারা দিত... পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না... বারান্দায় বসে আলাপ হলো এবং আমি বললাম সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি... তোমরা আগামীকাল রাতেও এসো... পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে... আমি আরও বললাম, আমি আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব... (আত্মজীবনী. পৃ. ১৯৬-১৯৭)।

১৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) বঙ্গবন্ধু সহরাজবন্দি মহিউদ্দিন আহমেদকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্বোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ২১ শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন এবং একই সময় তাঁর আমরণ অনশন শুরুর কথা ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অবহিত করেছিলেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে মহিউদ্দিন আহমেদও যোগ দেন।

ইতোমধ্যে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে বঙ্গবন্ধুর বিনা বিচারের একনাগাড়ে দু'বছরের অধিক সময় কারাগারে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর অনশনের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু বলেন:

...আমাকে যখন জেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল অনশন ধর্মঘট না করতে তখন বলেছিলাম, ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনা বিচারে বন্দি রেখেছেন। কোনো অন্যায়ও করি নাই। ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব, হয় আমি জ্যান্ত অবস্থায় না হয় মৃত অবস্থায়। "Either I will go out of the jail or my deadbody will go out" তারা সরকারকে জানিয়ে দিল" (আত্মজীবনী, পৃ. ১৯৭)।

অনশনে যাওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তিনি এভাবে তা ব্যক্ত করেন, '... একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে; (আত্মজীবনী, পৃ. ২০০)।

বঙ্গবন্ধুর অনশন পালন বিষয়ে আলোচনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বিলিতে আনোয়ারা খাতুন এমএলএ মূলতবি প্রস্তাব পর্যন্ত উত্থাপন করেছিলেন।[২]

যা হোক, এদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে তাদের কর্মসূচী পালন করতে এগিয়ে যায়। পুলিশের গুলিতে অনেকে হতাহত হল। এ সম্বন্ধে এবং ফরিদপুর শহরের অবস্থা বর্ণনা করে বঙ্গবন্ধু লিখেন:

২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাইরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। রেডিওর খবর। ফরিদপুর শহরে হরতাল হয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেলগেটে এসেছিল। তারা বিভিন্ন শ্লোগান দিচ্ছিল, 'রাষ্টভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', আরো অনেক শ্লোগান (আত্মজীবনী, পৃ. ২০৩)।

একনাগাড়ে দশদিন অনশন করার পর বঙ্গবন্ধু তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল, তা এভাবে বর্ণনা করেন–

আমাদের অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসেছে যে, যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর শান্তির ছায়ায় চিরদিনের জন্য স্থান পেতে পারি। সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে পাঁচ, সাতবার আমাদের দেখতে আসেন। ২৫

তারিখ সকালে যখন আমাকে তিনি পরীক্ষা করছিলেন হঠাৎ দেখলাম, তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি কোনো কথা না বলে, মুখ কালো করে বেরিয়ে গেলেন। আমি বুঝলাম, আমার দিন ফুরিয়ে গেছে। কিছু সময় পরে আবার ফিরে এসে বললেন, "এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।" আমার কথা বলতে কষ্ট হয়, আস্তে আস্তে বললাম, "অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।" ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, "কাউকে খবর দিতে হবে কি না? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?" বললাম, "দরকার নাই। আর তাদের কষ্ট দিতে চাই না।" আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল (আত্মজীবনী, পৃ. ২০৪-২০৫)।

উল্লেখ্য, অনশনে মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ঐ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু আপনজনদের নিকট চিরকুট আকারে চারখানা চিঠি লিখে রেখেছিলেন (আত্মজীবনী, পৃ. ২০৩)।

একনাগাড়ে ২৭ মাস নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে বিনাবিচারে জেল খাটা ও বার দিন অনশনের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও একদিন পর মহিউদ্দিন আহমেদ মুক্তি পান।

এভাবে রচিত হলো বাঙালির জাতীয় জাগরণের দিনপঞ্জি, ২১শে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ দ্রুত চতুর্দিকে এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, বঙ্গবন্ধুর একটি ঘটনার বর্ণনায় তা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঘটনাটি হলো, বঙ্গবন্ধুর শিশুকন্যা (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তখন তার বয়স মাত্র ৫ বছর) শেখ হাসিনা (বঙ্গবন্ধু ডাকতেন 'হাচু')-কে কেন্দ্র করে। এটি বাড়িতে তাঁর কারামুক্তির পর। বঙ্গবন্ধু লিখেন–

... পাঁচ দিন পর বাড়ি পৌঁছালাম... হাচু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, 'আব্বা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' (আত্মজীবনী, পৃ. ২০৭)। এরপর বঙ্গবন্ধুর মন্তব্য, ২১শে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে' (আত্মজীবনী, পৃ. ২০৭)।

ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর বিশিষ্ট ভূমিকা পালন আকস্মিক ছিল না। বাংলা, বাঙালি আর বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ নতুন নয়। বাঙালি সত্তা ছিল তাঁর রক্ত কণিকায়। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষে ও বাংলার নামের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাঁর যুগান্তকারী বক্তব্য সকলেরই জানা। তিনি স্পিকারকে উদ্দেশ করে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন–

... অন্য কোনো ভাষা জানি কি না-জানি তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা এখানে বাংলাতেই কথা বলতে চাই। যদি আমরা এটা উপলব্ধি করি যে আমরা বাংলা ভাষায় ভাব-বিনিময়ে সক্ষম, তাহলে সকল সময়েই আমরা বাঙলায় কথা বলব; এমনকি ইংরেজিতেও যদি আমাদের সমান দক্ষতা থেকে থাকে। যদি আমাদেরকে অনুমতি না-দেয়া হয় তবে আমরা হাউজ পরিত্যাগ করব। বাংলাকে অবশ্যই হাউজে গ্রহণ করে নিতে হবে– এটাই আমাদের স্ট্যান্ড।[৩]

পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তনের বিরোধিতা করে ১৯৫৫ সালের ২৫শে আগস্ট অপর এক ভাষণে স্পিকারকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন:

Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded may times that you should use [East] Bengal instead of [East] Pakistan, The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own.....[৪] (বাংলায়), 'স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটির একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য'।[৫]

১৯৫৫ সালে কেন, এরও বহু পূর্ব তিনি বাংলার মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৬ সালে দিল্লি মুসলিম লেডিসলেটরস কনভেনশনে অবাঙালিদের উর্দু শ্লোগানের বিপরীতে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলায় শ্লোগান দিয়েছেন (আত্মজীবনী, পৃ. ৫২)। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণকালে একই গাড়িতে করাচি আসার পথে উর্দুভাষী কয়েকজন পাকিস্তানিকে তিনি কবি কাজী নজরুল

ইসলাম (বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় কবি) ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (যাঁর গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত) কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন (আত্মজীবনী, পৃ. ২১৭)। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের শান্তি সম্মেলনে যোগদান করে তিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর এই ভাষণ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা খুবই প্রণিধানযোগ্য:

...আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম.. কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না?.... পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ায় অন্যান্য দেশেও আমি কম দেখেছি। আমি ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য (আত্মজীবনী, পৃ. ২২৮)।

তাই, প্রথম সুযোগেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এই গান স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্বাধীনতার পরপর ভারত থেকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাসের জন্য নিয়ে আসা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ও বাঙালি জাতির হয়ে জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণদান (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪), সবই ছিল তাঁর হৃদয়-উৎসারিত। তাই পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় বলবো আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।"[৬]



রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

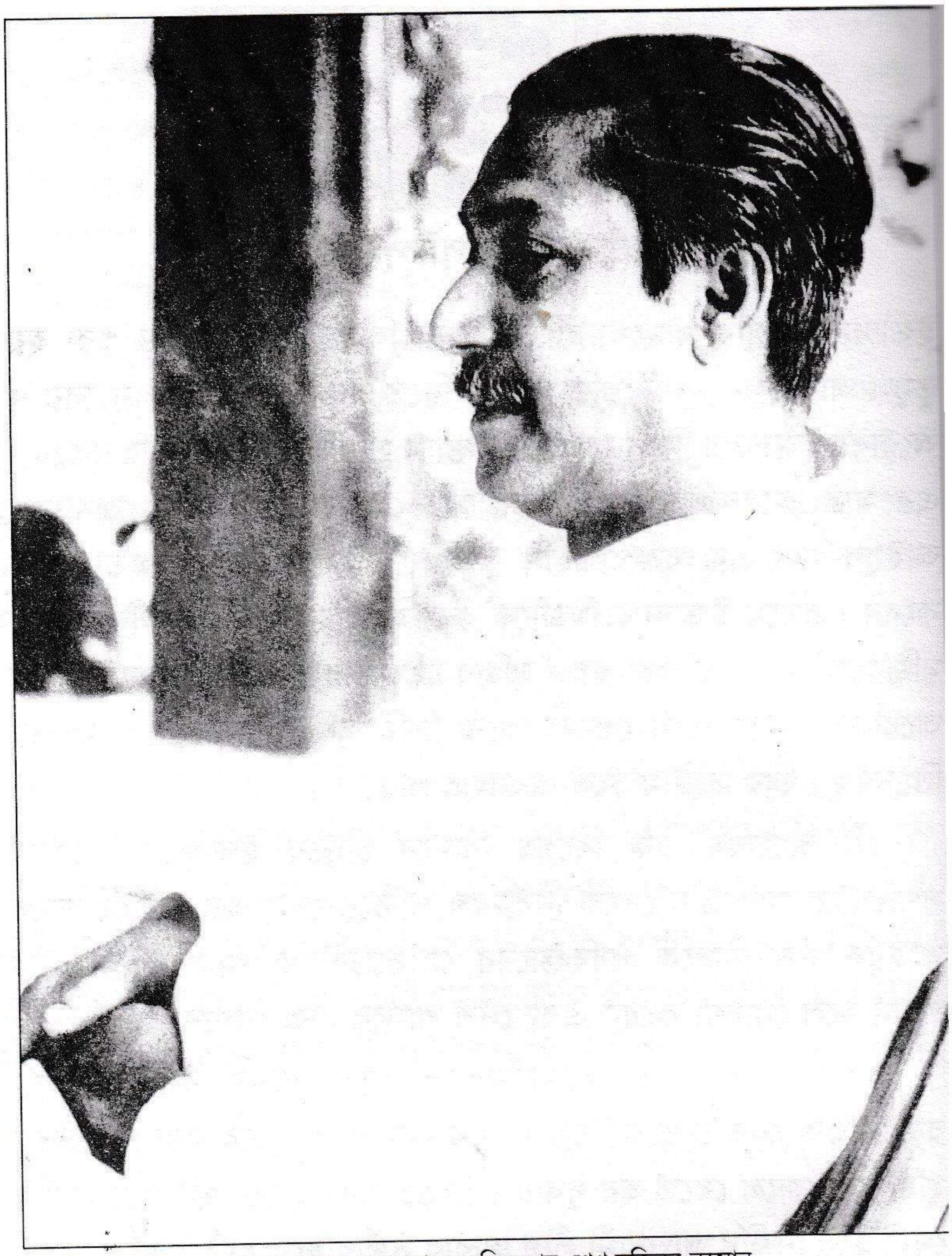
ইস্কান্দার মির্জার খামখেয়ালী শাসনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে শুরু হয় তুমুল আন্দোলন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এর মাত্র কয়েকদিন পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। প্রথমে ইস্কান্দার মির্জাকে করা হয় গৃহবন্দি। ভাসানী ও শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। মুজিব গ্রেফতার হন ১৯৫৮ সালের ১১ অক্টোবর। চৌদ্দ মাস জেলে থেকে তিনি মুক্তি পান ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর। তাঁর সংগ্রাম চলে অব্যাহত গতিতে।

২৪ অক্টোবর এক বিশেষ বিমানে চড়িয়ে ইস্কান্দার মির্জাকে সপরিবারে পাকিস্তান থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সাথে সাথে আইয়ুব খান নিজকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর প্রধান বলে ঘোষণা করেন এবং দেশ শাসনে হাত লাগান।

আইয়ুব খান খুব কড়াকড়িভাবে দেশ শাসন করে চলেন। রাজনৈতিক নেতাদের আটকে রাখেন কারাগারে। চার বছরের ভেতর মুজিবকে জেলে যেতে হয় দুবার। ১৯৬১ সালের ১৮ জুন তাঁকে মুক্তি দেয়া হলে নির্জীব আওয়ামী লীগ আবার সজীব হয়ে ওঠে। বন্দি নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন।

২৫ জুন শেখ মুজিবসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন।

এরপর থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্রুত একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাতে প্রাণ হারায় বহু হিন্দু-মুসলমান। ১৯৬৫



১৯৬২ সালে জেল থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমান

সালে সংঘটিত হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। সতেরো দিন স্থায়ী এ যুদ্ধে পাকিস্তানের অর্থনীতি সমস্যার মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে অরক্ষিত রাখা হয়। অবশেষে যুদ্ধাবসান ঘটে।



যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে ।

১ । বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে ।

২ । বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে ।

৩ । পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে ।

৪ । কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে ।

৫ । পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির-শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেংকারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে ।

৬ । শিল্প ও কারিগর শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বাসিত করবার ব্যবস্থা করা হইবে ।

৭। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮। পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৯। দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও সকল বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২। শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারীর ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে

এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪। জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও



জাপান সফরকালে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরংকুশ করা হইবে।

১৫। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭। বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌ-বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।



সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা

স্বৈরাচার পাকিস্তানি শাসকদের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা ছাত্র-গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবিতে ব্যাপক ছাত্র-গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি :

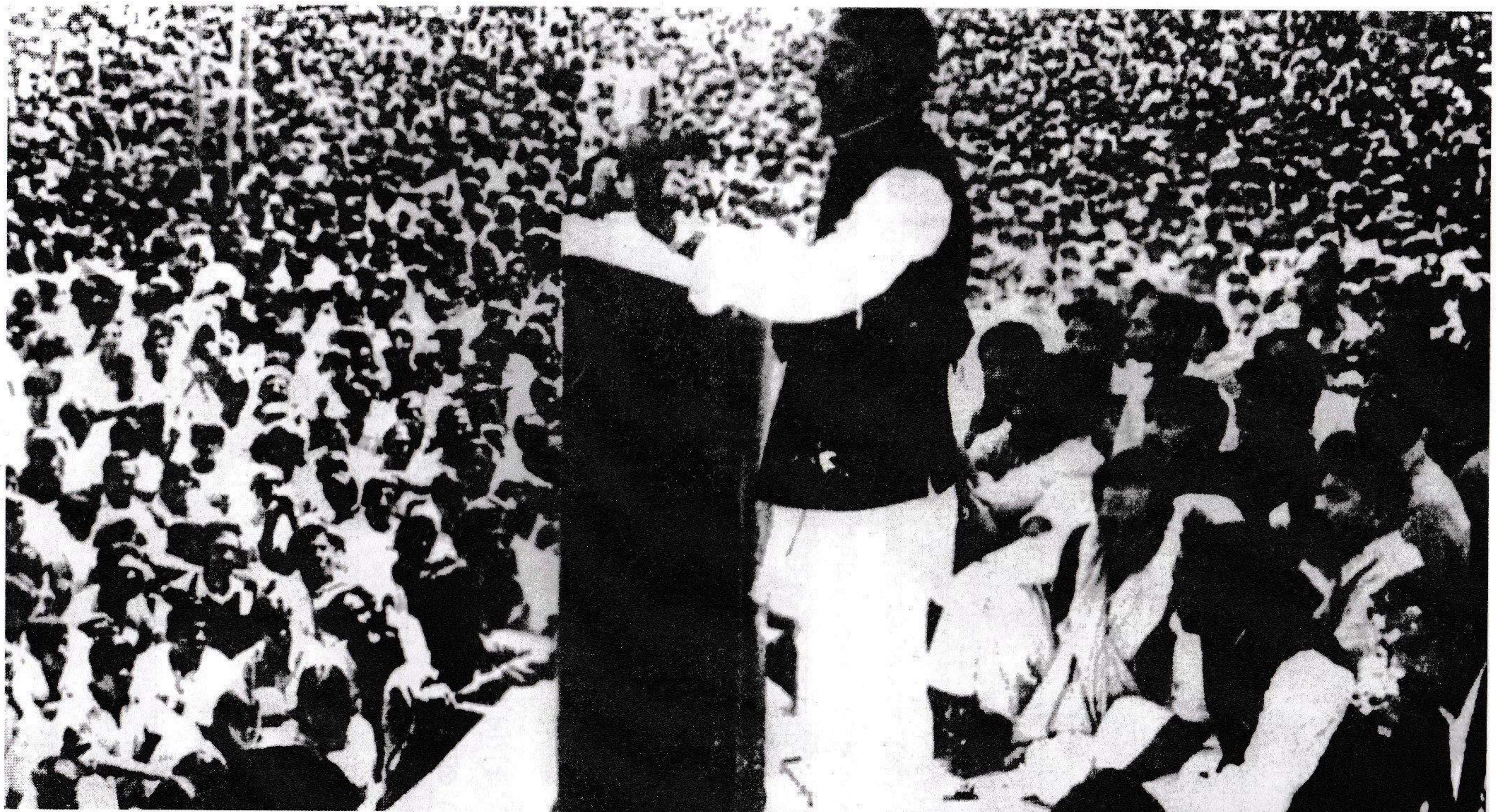
১। (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্সিয়েল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই.এ; আই.এসসি; আইকম ও বি.এ; বি-এসসি; বি.কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম.এ ও এম.কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসেবে প্রদান করিতে হইবে।



২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতার বিশাল সমাবেশে বাঙালি জাতির প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উপাধি দেয়া হয়– 'বঙ্গবন্ধু'

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাশ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনালে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই.ই.আর. ছাত্রদের দশ-দফা; সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের এম.বি.এ ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা "ফ্যাকাল্টি" করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টিমারে, ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কন্সেসন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধা-সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন হামিদুর নীতির প্রামাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র-সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে :

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক, নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন

সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা এবং বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহ্শিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে। এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করা অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।



আওয়ামী লীগের ৬ দফা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার জন্যে ছয়দফা দাবি পেশ করেন। এই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে আখ্যায়িত করে শেখ মুজিব বলেন, আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বাঁচার দাবি হিসেবে ছয় দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্যে পেশ করছি।

মুজিব প্রস্তাবিত ছয় দফায় যা ছিলো তার সংক্ষিপ্তসার হলো :

১ নং দফা : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২ নং দফা : ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে শুধুমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার–এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকবে।

৩ নং দফা : এই প্রস্তাবে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ দুটো থেকে যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেই চলবে।

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে টাকা-পয়সা কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই টাকা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট

বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪ নং দফা : সকল প্রকার ট্যাক্স খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রাজস্বের নির্ধারিত



৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) : লাহোরে ৬-দফার ঘোষণা দিচ্ছেন শেখ মুজিব

অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে নিজ থেকেই জমা হয়ে যাবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

৫ নং দফা : এই দফাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে।

৪. দেশীয় দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ব্যবসায়িক অফিস স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬ নং দফা : পূর্ব পাকিস্তান মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষী বাহিনী গঠন করতে হবে।



আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্ত ভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয় শিক্ষালাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যে এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি–তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬ দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬ দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমি স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এদের অফুরন্ত, মুখ এদের দশটা, গলার সুর এদের শতাধিক। এরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এরা আছেন সরকারি দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় এরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোন সন্দেহ নেই। তথাপি ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী, বিশেষত আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬ দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়িয়ে পড়বেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারি সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি, সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী, বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানি মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে-আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল।

মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোটও দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটারটা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরানো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁতকাইয়া ওঠেন, তারা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমি স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভাল, এ বিচার ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এই সব প্রশ্নে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক্।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে ফেডারেশন সরকারের এখ্‌তিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার ও এই দুইটি বিষয় থাকিবে।

অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়োছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তা স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন টেলিগ্রাফ পোস্টাপিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আবার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র

দুই বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া স্টেট বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমি স্বার্থী শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস্' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানি, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও প্রদেশকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে, তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি প্রকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়েছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে:

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই অবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান করিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, একথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা আমার এই প্রস্তাবে রাজি না হন, তবেই শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা এই প্রস্তাবে রাজি হইবেন।' আমরা তাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছি, তারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকসমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নক্‌শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্‌শার মুদ্রা প্রচলন করা হইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার জন্য অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু'একখানি ব্যাংক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাংকের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে।

বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুঁদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতিহেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্য, জনগণের বিশেষত পাটচাষীদের দুর্দশা সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমি স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবেন। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া?

প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্য্যের দায়িত্ব না দেওয়া হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সে ব্যবস্থা নিঁখুত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এটাই সরকারি তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এ খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থদফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী ও পররাষ্ট্র দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকরী হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন বিধান থাকিবে যে, আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সে টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক

সুবিধা হইবে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়ত, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসারবাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়ত, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থত ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থবিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল্ ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিংগ্‌ল্ ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখ্‌তিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখ্‌তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখ্‌তিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানি চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্প-জাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না ওঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানি করে আমদানি করে সাধারণত তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশি। বিদেশ হইতে আমদানি করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখ্‌তিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগ অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদি খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের থেকে বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয়

পঞ্চাশ। এ খেলা গরিব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফাতানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরদ্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানির বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের

দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এ-সব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়ে যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাই-বোনদের খেদমতে আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক. তারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এ দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি এও জানি

যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত, তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা বাষট্টি টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকার খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। আপনারা জানেন অর্থ বিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে, প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরিব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এই সব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানিরা ঐ পরিমাণে গরিব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ, আমার জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্‌টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদের লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্‌টাই চাই। আপানাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে :

(১) প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাইয়ের দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানির ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানি মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার। থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত হবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্যসত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিঁখুত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম, পূর্ব পাকিস্তানিরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানিদের। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না, আপনাদের পি.আই.ডি.সি আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি.আই.টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্ত ানিকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমনি উদরতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইন্‌সাফবোধই পাকিস্তানি দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই

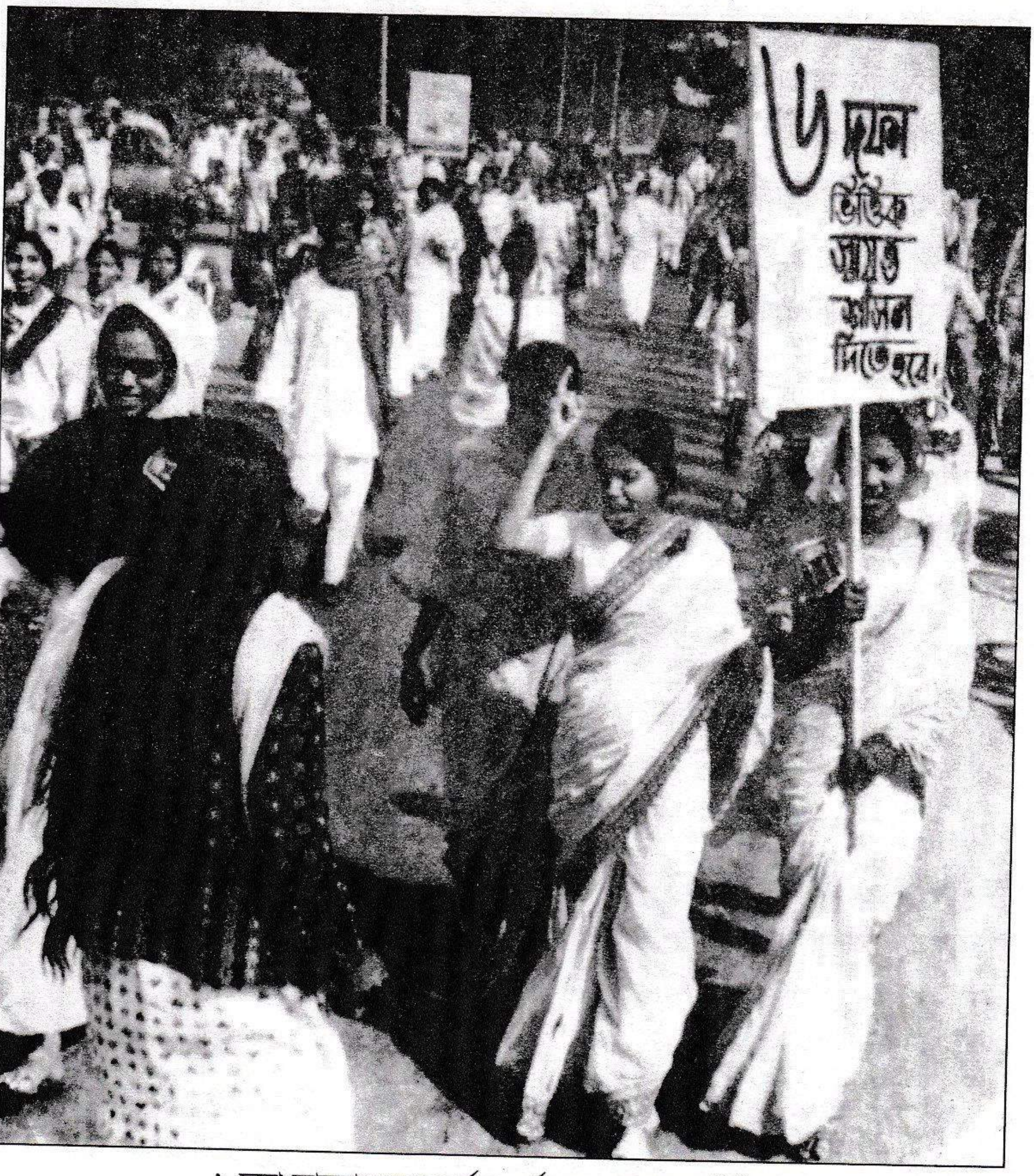
পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এই সব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া-শুনিয়া যারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায় তারা পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানে ঐক্য অটুক ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা এই মাপকাঠিতে আমার ৬ দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তা যদি তারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ৬ দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক



৮ মে (১৯৬৬) : ৬ দফার পক্ষে কর্মসূচি পালনকালে নারায়ণগঞ্জে গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান

বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথা নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়ন-মণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য



৬-দফা আন্দোলনের সমর্থনে সর্বস্তরের জনগণের মিছিল

দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্‌ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনি আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আমার যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

শেখ মুজিবুর রহমান



আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও শেখ মুজিব

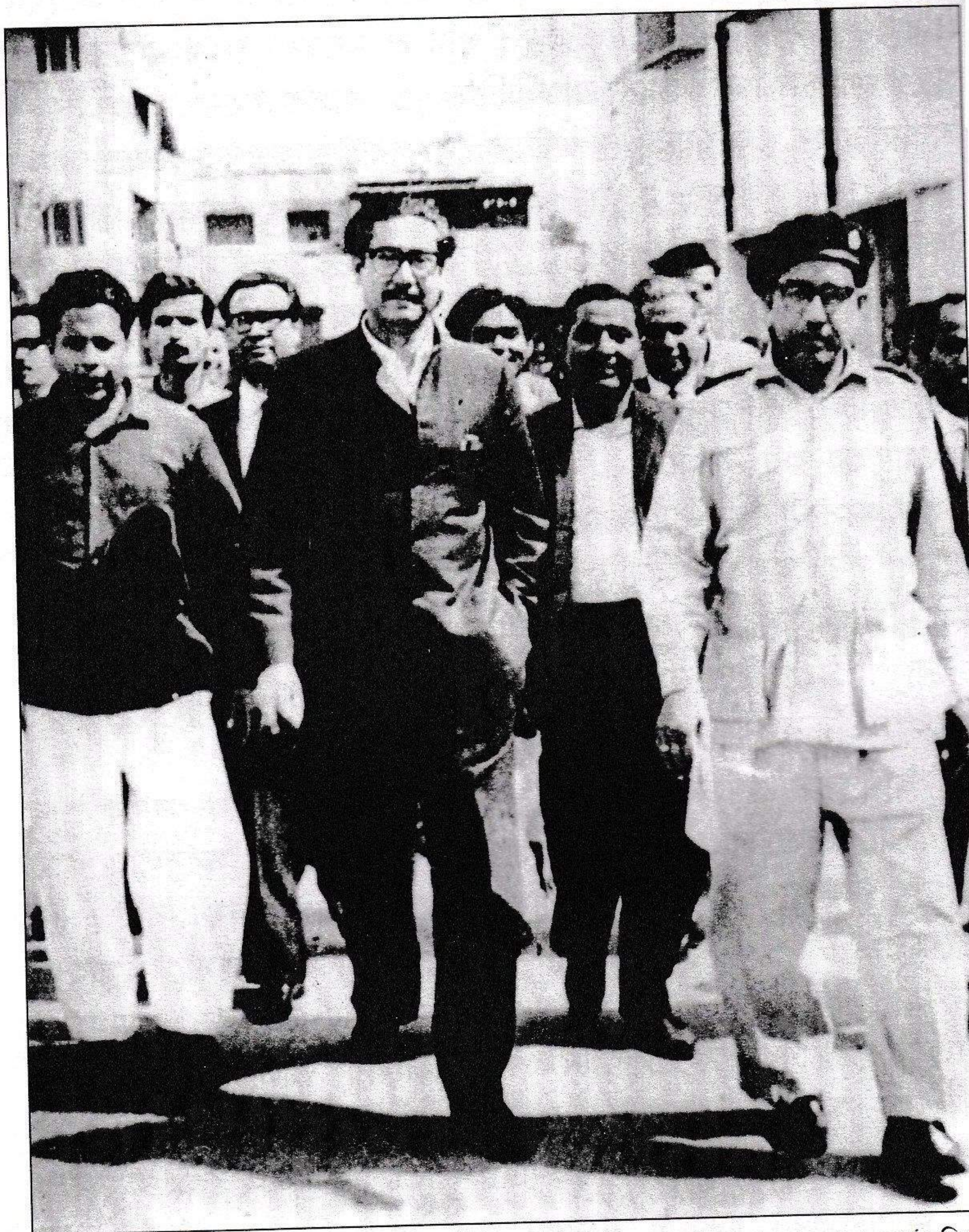
১ মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওদিকে ছয়দফা পেশ করার সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিক ও শাসকচক্রের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। আইয়ুব খান এটিকে দেশ বিভক্তিকরণের ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। খুলনা, যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার ও মুক্তি দেয়া হয় মুজিবকে। তিন মাসে মুজিবকে মোট আটবার গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু জেল গেট থেকে বাইরে পা দেবার সাথে সাথে আবার সামরিক জিপে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। সেই মাসেরই ১৮ তারিখে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা করা হয়। সর্বমোট পঁয়ত্রিশজনকে এ মামলার আসামী করা হয়। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে কুখ্যাত এ মামলাটি পরিচালনার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আইনজীবী ও বিচারক আনা হয়। চলতে থাকে গভীর ষড়যন্ত্র।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় এগার দফা দাবি। এর মাঝে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমানের মামলা শুরু হয়। ফলে ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ মামলার প্রতিবাদে। চারদিকে শ্লোগান ওঠে জেলের তালা ভাঙবো–শেখ মুজিবকে আনবো। শ্লোগান ওঠে বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো–বাংলাদেশ স্বাধীন করো। তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।

আগলতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলে নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে জবানবন্দি দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন :

স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে, ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ



১৯৬৯ সাল : জেলখানা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে শেখ মুজিব

গঠন করি। আওয়ামী লীগ–পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধান সভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করি। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতোমধ্যে কয়েক বছর কারা নির্যাতন ভোগ করতে হইয়াছিল।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে আমার উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তি লাভকালে আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়– যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয়ে তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত। অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধীদলের অঙ্গদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খানের

বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহ্‌তারেমা ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে আস্থাবান–আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান–ছয় দফা কর্মসূচি

উপস্থাপন করি। ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান–উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হইয়াছে।

অতঃপর আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম তখন তাহারা যশোরে আমার পথ রোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে আমাকে গ্রেফতার করে।

আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তবর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেই দিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই, আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারি পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন সকালে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারি পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয়, একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারি প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে–সম্ভবত ৮ই মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায়

নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল'-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার দলের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুউদ্দীন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি খন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীসহ বহু অন্যান্য নেতা। ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম.এন.এ. প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন এডভোকেট, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুসা, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মদ এডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম. এন. এ. জনাব আমজাদ হোসেন, এডভোকেট জনাব আমিনুদ্দিন আহম্মদ, পাবনার এডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদদুল্লাহ, এডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব হারুনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান,

পাবনার এডভোকেট জনাব হাসনাইন, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আব্দুর রহমান সিদ্দিকীসহ অন্যান্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষার বিধি ৩২ ধারা (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র–পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার সংগঠন ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোক গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান তাঁহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারি সমক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে কারাগারে থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখে রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহিঃর্জগৎ হইতে

বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন, আমি প্রথম এডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌশুলী নিয়োগ করি।

কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘণ্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয়দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এলএস সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ, কামালউদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী কর্মচারিদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান–এই তিনজন সিএসপি অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাঁহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাঁহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লে. কর্ণেল মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি

নাই কিংবা আমার অথবা লে. কর্ণেল মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দীনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দিই নাই। আমি কখনও ডা. সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাঁহারা চট্টগ্রামে আমার সংগঠনের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার সংগঠনে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী; এম.এন.এ. ও এম.পি.এ.। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার সংগঠনভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার সংগঠনের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম.এল.এ.এম.পি.এ. ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাঁহাদের কাহারও নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল.এম.এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্য অনুরোধ করতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডা. সাঈদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডা. সাঈদুর রহমানের গৃহে কখনও গমন করি নাই।

আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল–দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কখনও আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম– ছয়দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির

ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে–তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে–এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে একথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

চারদিকে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। দিনে দিনে আন্দোলনের চাপ এতই বেড়ে যায় যে, আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়। এর আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি অবশ্য সার্জেন্ট জহিরুল হক শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি বন্দি অবস্থায় প্রহরীদের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়।

কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করা হয়। এই বিশাল সভায় শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। মুজিব শাসকগোষ্ঠীকে সাবধান করে ভাষণ দেন। ফলে শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ে। তারা শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে বসার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। ১০ থেকে ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত সে বৈঠকে পরোক্ষভাবে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব প্রদানের লোভ দেখানো হয়। কিন্তু মুজিব সেই প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত ছয় দফা মেনে নেয়ার জন্যে জোর দাবি জানান। ফলে লাহোরে অনুষ্ঠিত সেই গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়–মুজিব খালি হাতে ঢাকায় ফিরে আসেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু সরকারের কাছে সাধারণ নির্বাচনের জন্যে দাবি জানান। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি নির্বাচনী এক আবেদন পেশ করেন।



শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী আবেদন

আমার প্রিয় দেশবাসী ভাইবোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আগামী ৭ই ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দীর্ঘ তেইশ বছরের অবিরাম আন্দোলনের পথ বেয়ে শত শত দেশপ্রেমিকের আত্মদান, শহীদের তাজা রক্ত আর হাজার ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীর অশেষ নির্যাতনভোগ ও ত্যাগের বিনিময়ে পূর্ব বাংলার জনগণের সামনে আজ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্বাচিত হবার পরপরই পরিষদ সদস্যরা বা রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার গদিতে বসে পড়তে পারবে না। তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ সমাধা করতে হবে। বস্তুত স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

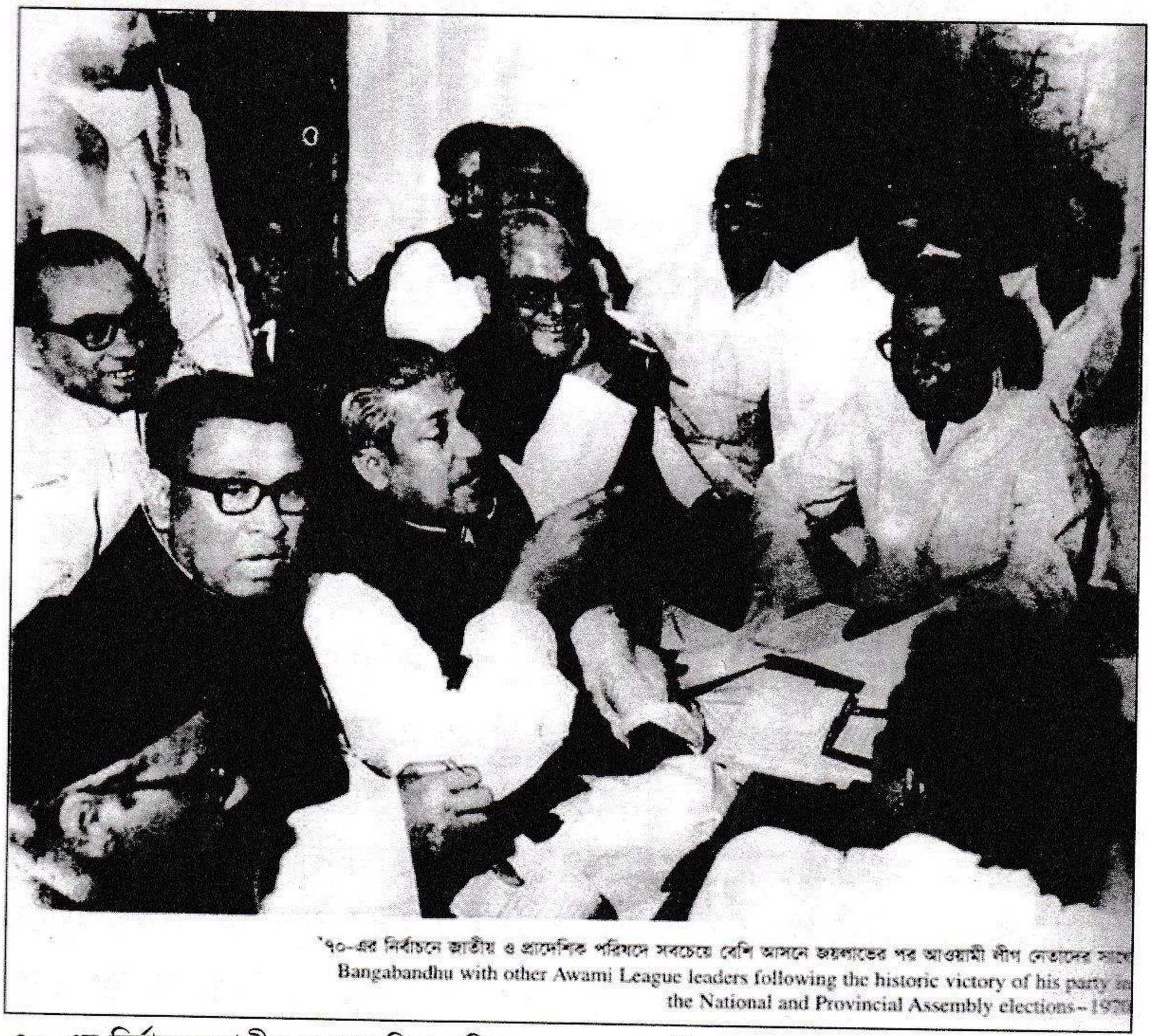
আমার দেশবাসী,

আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরও যদি কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রতিনিধিগণ দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ চিরতরে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। কেননা সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও একনায়কত্ববাদের প্রতিভূরা দেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার কাজে পদে পদে বাধা দেবে। ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহা সুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা মানুষের দুঃখমোচন এবং বাংলার মুক্তি সনদ ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়িত করা যাবে। একমাত্র এই কারণেই আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং পূর্ব বাংলার প্রতিটি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

কারাগার থেকে বেরিয়ে আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ভোটের দাবি তুলেছিলাম; আজ সেটা আদায় হয়েছে। তাই



'৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে
Bangabandhu with other Awami League leaders following the historic victory of his party in
the National and Provincial Assembly elections–197

৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সবচেয়ে বেশি আসনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান

ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী। এখন পূর্ব বাংলার থেকে নির্বাচিত পরিষদ সদস্যরা যদি একই দলের কর্মসূচি ও আদর্শের সমর্থক হন, অর্থাৎ সকল প্রশ্নে তাঁরা ঐকমত্যে থাকতে পারেন তবে আমরা অতীতে চাপিয়ে দেওয়া সকল অবিচার, বৈষম্যমূলক আচরণ, আইন-কানুন এবং বে-ইনসাফি শোষণের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সম্মিলিত দাবির মুখে দেশের অপর অংশের পরিষদ সদস্যগণ পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তিসনদ ৬ দফা ও ১১ দফা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। এর কারণ, পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব। আর যদি আমরা বিভক্ত হয়ে যাই এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের অনৈক্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আত্মঘাতী সংঘাতে মেতে উঠি তাহলে যারা এদেশের মানুষের ভালো চান না ও ওখানকার সম্পদের উপর ভাগ বসাতে চান তাদেরই সুবিধা হবে এবং পূর্ব বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত, ভাগ্যহত ও দুঃখী মানুষের মুক্তির দিনটি পিছিয়ে যাবে।

আমার ভাইবোনেরা,

শেরে বাংলা আজ পরলোকে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আমাদের মাঝে নাই। যাঁরা প্রবীণতার দাবি করছেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ইতোমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বাঙালি-বিদ্বেষীদের নিকট নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে তল্পীবাহকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নয়তো নিষ্কর্মা, নির্জীব হয়ে পড়েছেন এবং অন্যের সলা-পরামর্শে বশীভূত হয়ে কথায় ও কাজে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি, ভাগ্য বিপর্যস্ত মানুষের হয়ে আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার সার্থক রূপদানের দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। এবং সে কঠিন দায়িত্ব গ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার উপযোগী করেই আমাদের প্রিয় সংগঠন আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা হয়েছে। নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কণ্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্য যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে

এঁকেছিলাম–সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি–তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনতার দাবি আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এখন নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবি আদায়ের দায়িত্ব যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সে শক্তি হলো পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। কারণ, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের চাবিকাঠি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন–পূর্ব বাংলার সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী,

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাঙালিরা কীরূপ বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলাম। বিশ্বের সাথে এবং দেশের কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় আমাদের সকল যোগাযোগের সম্পর্ক ভেঙে পড়েছিল। অবরুদ্ধ দ্বীপের ন্যায় পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটাচ্ছিল। তথাকথিত শক্তিশালী কেন্দ্রে প্রশাসনযন্ত্র বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরি প্রয়োজনের দিনেও আমাদের নাগালের বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্য নয়, বাংলার মানুষের দুঃখের অবসানের জন্য ১৯৬৬ সালে আমি ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবি হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দাবি; অঞ্চলে অঞ্চলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবি। এই দাবি তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটার পর একটা

মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানি করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ স্বরূপ আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোনো নেতা নয়, কোনো দলপতি নয়, আপনারা–বাংলার বিপ্লবী, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে মনু মিয়া, আসাদ, মতিউর, রুস্তম, জহুর, জোহা, আনোয়ারের মতো পূর্ব বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার



১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী ইস্তেহারের খসড়া দেখছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাই নাই, জীবনে কোনোদিন ভুলব না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মতো আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাইবোনেরা,

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে দিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তেজগার নাখালপাড়ায় মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়ল, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিল, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দি শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হল, বাংলার যে কৃষক ধানক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারাল–তাদের বিদেহী অমর আত্মা পূর্ব বাংলার পথে-প্রান্তরে ঘরে ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬ দফা ও ১১ দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নের পরই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে পূর্ব বাংলার প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে জালেমদের ক্ষুরধার নখদন্ত জননী বঙ্গভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হাজারো সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হব। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা।

নিবেদক–

আপনাদেরই শেখ মুজিবুর রহমান

১ ডিসেম্বর, ১৯৭০



১৯৭১ সালের ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতের লেখা

বাংলা দেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের এবারের সেই সংগ্রাম। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট বন্ধুক রোধনে দিয়ে বাংলা দেশের মানুষকে এবং স্তব্ধ করা যাবেনা। কিনবা মনতা এবং ঐক্যবদ্ধ।

শত্রু বাহিনীর গুলি যে কোন জায়গা স্বীকারের আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং এবার সমস্ত দুনিয়ার হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের জয়ী ন্যায় সংগত। তাই আমরা আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলা দেশের স্বাধিকার আন্দোলন দৃঢ়তর করার আমাদের প্রতিটি দিনের সংগ্রামকে সফলের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা।

(মুজিবুর রহমান)
৩/৩/৭১



ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতায় এলেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর ছয় দফা আদায়ের দাবি আরো জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ এই দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু বিবেকবান মানুষও ছয়দফার প্রতি সমর্থন জানায়। দেশের নানা জায়গায় ছাত্র-জনতা আর পুলিশের মাঝে শুরু হয় সংঘর্ষ–মিছিলে চলে নির্বিচারে গুলি। কিন্তু হরতাল, মিছিল আর অবরোধ চলতেই থাকে।

দেশের যখন এমন টালমাটাল অবস্থা তখন হঠাৎ ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সেনাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করার পরপরই পাকিস্তানের উভয় অংশে সামরিক আইন জারি করেন। মিটিং মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। তবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা শেখ মুজিবের সাথে গোপনে যোগাযোগ চালিয়েই যেতে থাকে। সামরিক শাসক ব্যর্থ হয়।

সামরিক আইন জারি করার পরেও গণরোষ দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হন ইয়াহিয়া। ফলে একান্ত বাধ্য হয়েই ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেন তিনি। চারদিকে অস্থিরতা।

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে এক প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। তাতে মারা যায় কয়েক লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদিপশু। বিধ্বস্ত হয় সমগ্র জনপদ। তাই দক্ষিণাঞ্চলীয় ১৭টি আসন স্থগিত রেখে ৭ ডিসেম্বর জাতীয় ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের ভেতর ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে

১৬০টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগের অভাবনীয় বিজয় হয়।

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান'স পিপল্'স পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মাঝে ৮১টি আসন লাভ করে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ অর্জন করে শতকরা ৯৮.৫ ভোট ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্'স পার্টি শতকরা ৫৭.৭ ভোট।

সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবেরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু ইয়াহিয়া ও ভুট্টো আওয়ামী লীগের এ বিজয় সহজভাবে মেনে না নিয়ে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। ইয়াহিয়ার নীরব সমর্থনে ভুট্টো তাঁর দলের কর্মীদের নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে চলেন। ষড়যন্ত্র ও গোপন দেন-দরবার চলতে থাকে।

সেবার ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। এ ব্যাপারে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার অজুহাত দেখিয়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন। তিনি এক আলোচনা বৈঠকে বসেন শেখ মুজিবুরের সাথে। নির্বাচিত সদস্যদের কাছে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন সম্পর্কে চিঠিও পাঠানো হয়। কিন্তু এরই মাঝে হঠাৎ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভুট্টো ঘোষণা করেন, এবারের অধিবেশন ইসলামাবাদে হতে হবে। ঢাকায় অধিবেশন করার চেষ্টা করলে সর্বশক্তি দিয়ে তিনি তা প্রতিহত করবেন। তাঁর দলের কোনো সদস্য ঢাকায় অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন না। কারণ তাঁর আশঙ্কা, ঢাকায় অধিবেশন হলে ঢাকা পার্লামেন্ট কসাইখানায় পরিণত হবে! অনেক চিন্তাভাবনা করে অবশেষে ভুট্টো নির্লজ্জের মতো আরো বললেন, পাকিস্তানের দুই অংশের জন্যে দুজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে।

ভুট্টোর এসব দাবি অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান বিরোধী হলেও ইয়াহিয়ার জোরালো সমর্থন ছিল তাঁর প্রতি। তাই একের পর এক হুমকি দিয়ে চলেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে বসে। ভুট্টোর এসব কথা শুনে বাঙালিরা বুঝতে পারে, পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিক ও শাসকগোষ্ঠী সহজে শেখ মুজিবের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেবে না। তারা এ পরাজয় মেনেই নেবে না।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স মাঠে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শেখ মুজিব স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর দাবির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সারা পাকিস্তানে আমরা মেজরিটি পেয়েছি। তাই এদেশ শাসন করার অধিকার এবার আমাদের। এ দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সোচ্চার।

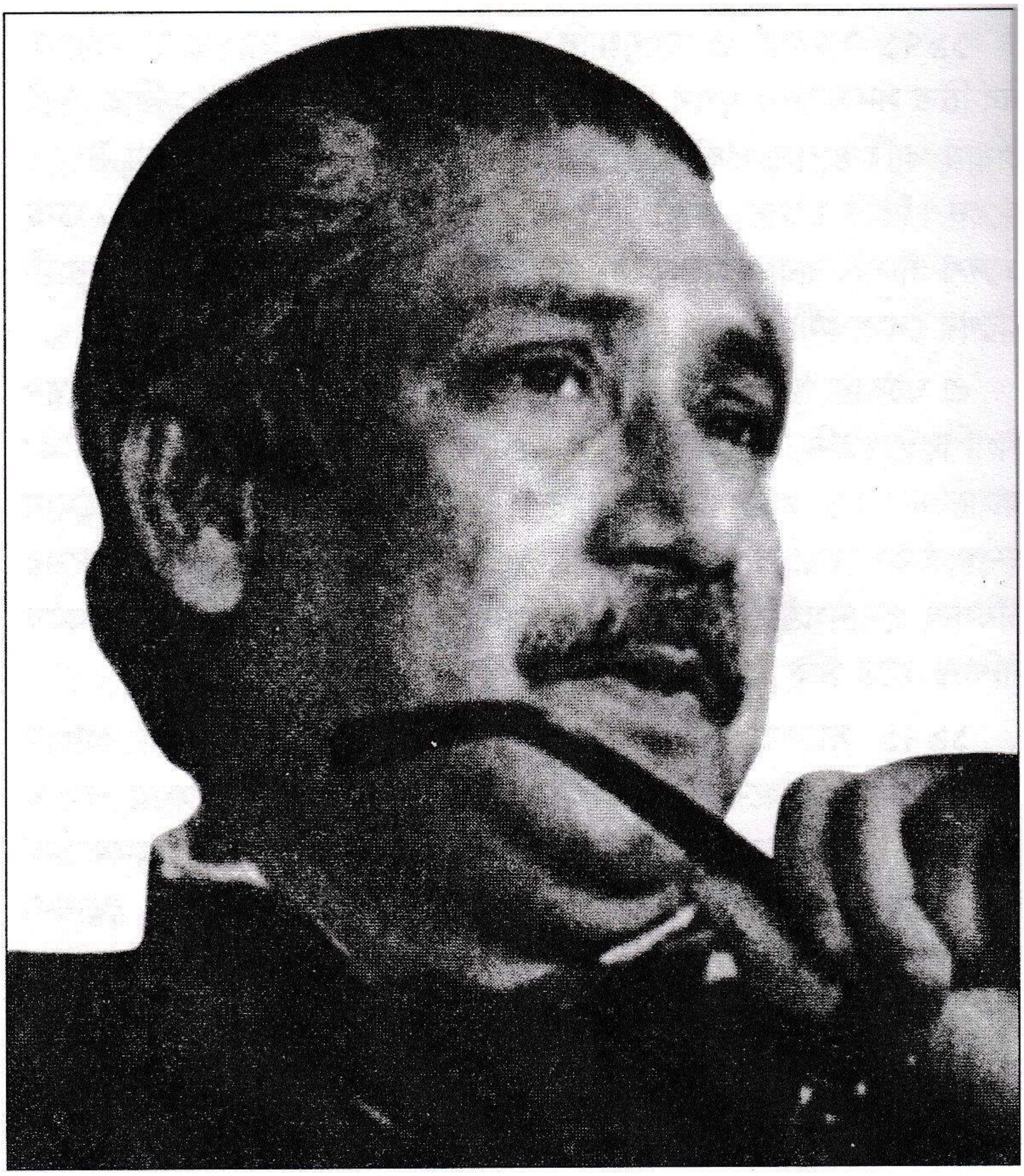
এ ঘটনার পর ৬ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন শিগ্‌গিরই তিনি মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসার জন্য ঢাকা আসবেন। ১১ জানুয়ারি তিনি ঢাকা আসেন। শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান সাংবাদিকদের বলেন, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিশ্চিত হতে চাই আমি।'

১৯৭১ সালের ২৭ জানুয়ারি ভুট্টো তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকায় আসেন শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করার জন্য। দফায় দফায় বৈঠক চলে চারদিন ধরে। সিদ্ধান্ত হয় উভয় নেতার সাথে আলোচনা করে পরে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করবেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান হাইজ্যাকিংয়ের ঘটনার অজুহাতে তা ৩ মার্চে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

এদিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জাতীয় পরিষদে কি ঘটবে তা জানার জন্যে অধীর আগ্রহে দিন কাটাতে থাকে। তারা দিনের পর দিন মুক্তির প্রতীক্ষা করতে থাকে।

২৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠকে পাকিস্তানের জন্যে উপযোগী খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করা হয়। শাসনতন্ত্র পেশ করেন ড. কামাল হোসেন। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এতে বোঝা যায় গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তাদের ভেতরে।



বঙ্গবন্ধুর সতর্ক বাণী

"আমি সামনে ভয়ংকর দিন দেখতে পাচ্ছি। আমি সব সময়ে আপনাদের সঙ্গে নাও থাকতে পারি।....কিন্তু আপনাদের কাছে আমার দাবি রইল। বাংলাদেশের জনসাধারণ যেন তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; তা' আপনারা নিশ্চিত করবেন। শহীদদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। জয় বাংলা।"

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১



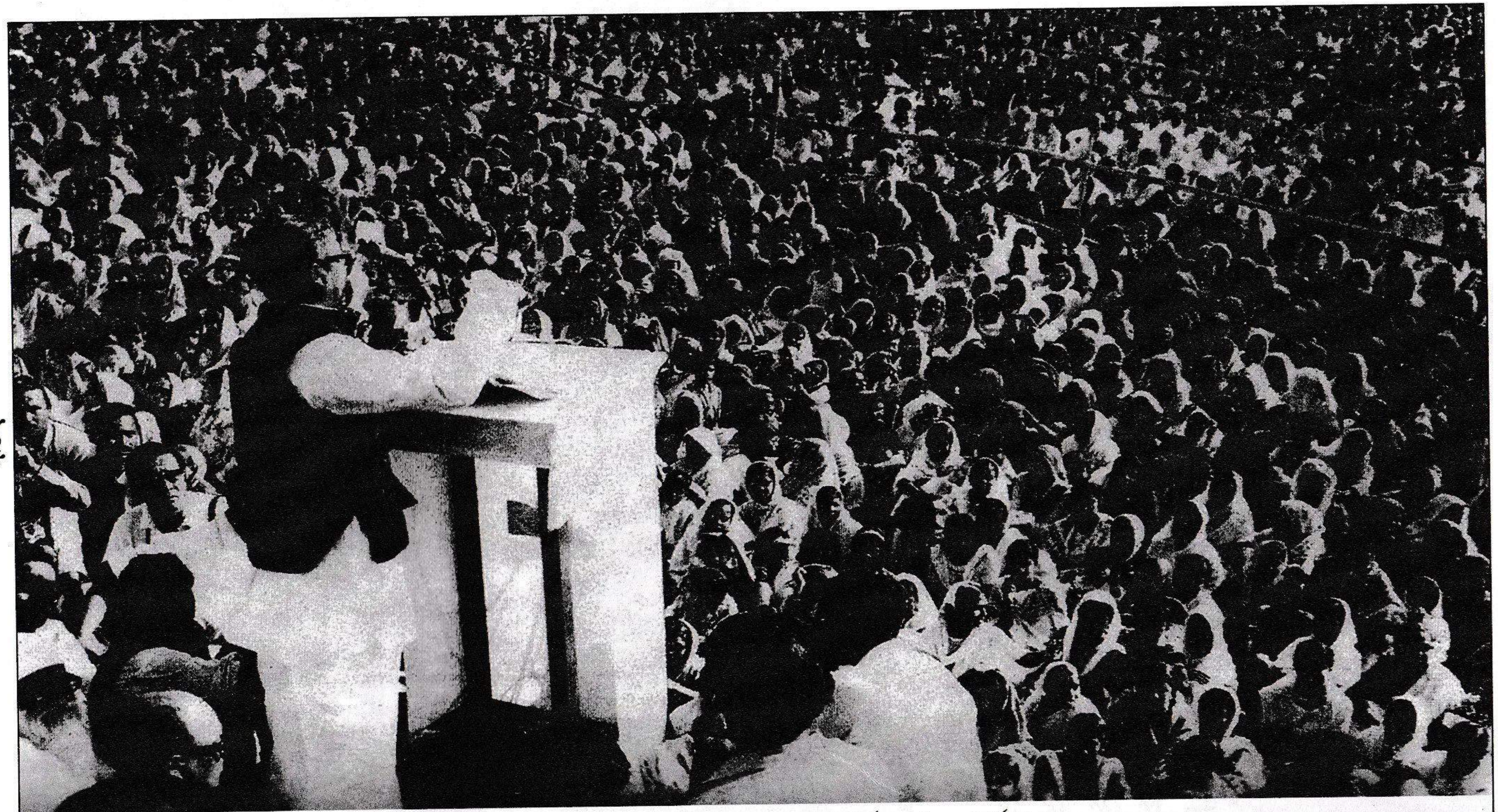
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর নানা ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আবার পথে পথে শুরু হয় মিছিল-মিটিং, ব্যারিকেড। শেখ মুজিব জনগণকে শান্ত থাকতে বলেন। তবে একথাও তিনি বলেন যে, ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক ভাষণ দেবেন।

৭ই মার্চ সকালে শুধু ঢাকা শহর নয়, আশপাশের শহরগুলো থেকে কমপক্ষে দশ লাখ মানুষ এসে জড়ো হয় রেসকোর্স ময়দানে। দলীয় নেতা-কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে মঞ্চে আসেন শেখ মুজিব। তারপর জনতা ও দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন :

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়। বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম আমরা? নির্বাচনের পরে বাংলার মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল সংসদ বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলছি, বলতে হয় তেইশ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস–এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ–এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।



এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, রেসকোর্স ময়দান, ৭ মার্চ ১৯৭১

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে ইয়াহিয়া খান এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন–আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না–রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা সংসদে বসবো। আমি বললাম, সংসদের মধ্যে আলোচনা করবো–এমনকি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম–আপনারা আসুন, বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব।

তিনি বললেন : পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বার যদি পূর্ব বাংলায় আসে তাহলে কসাইখানা হবে সংসদ। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ সংসদে আসে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকানপাট জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে।' আর হঠাৎ ১ তারিখ সংসদ বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে সংসদ ডেকে ছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া

হলো, সংসদে দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তি পূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

কি পেলাম আমরা? জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, বহি-ঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে–তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু–আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে!

আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের রাউন্ড টেবিল? কার সঙ্গে কথা বলব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠকে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন তাতে সমস্ত দোষ তারা আমাদের ওপর, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার! ২৫ তারিখ সংসদ ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, শহীদের রক্তে উপর পাড়া দিয়ে সংসদ খোলা চলবে না। আমার দাবি মানতে হবে। সামরিক শাসন মার্শাল-ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিকবাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ফেরত যেতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের

তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা সংসদে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে সংসদে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলায় কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে–শুধু সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, জর্জকোর্ট, আধাসরকারি দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারিরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি একটি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়–তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যদ্দূর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারিদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো–কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই

বাংলায়–হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ দেয়া-নেয়া চালাবেন।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে সুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোল। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

৭ মার্চের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবন প্রকৃতপক্ষেই আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যা যা বলেছিলেন সেভাবে প্রতিটি কাজ চলতে থাকে। ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় শাসকগোষ্ঠীর চাকা। মূলত সরকার অচল হয়ে যায়।

এ সময় অপ্রত্যাশিতভাবেই ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস. এম. আহসানকে সরিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গভর্নর করে পাঠান। এ ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আরো ক্ষেপে যায়। মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করব। পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই। এক পাকিস্তান আর রাখবো না।'

এ ঘোষণার পর জনতা নব উদ্যমে পথে নামে। সেনাবাহিনীর চলাচলের পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। ট্যাক্স দেয়া বন্ধ করে দেয়। কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। আদালত প্রাঙ্গণ হয়ে যায় শূন্য। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাঙালিরা আজ স্বাধীনতার জন্যে ঐক্যবদ্ধ। কোনো শক্তি

আর আমাদের এ দাবি থেকে এক চুল সরাতে পারবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর টনক নড়ে। প্রথম সমঝোতা আলোচনায় বসার জন্যে অনুরোধ জানান ভুট্টো। কিন্তু মুজিব সাফ জানিয়ে দেন, ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্যে বাঙালি আজ ঐক্যবদ্ধ। শুধু অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি পেলেই আলোচনায় বসবেন তিনি।

একাত্তরের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা আসেন। ১৬ ও ১৭ মার্চ তিনি শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসলেও কোনো সমাধানে পৌঁছুতে ব্যর্থ হন। তবে আলোচনা আরো চলবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এদিকে ছাত্রনেতা ও দেশবাসীর কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্যে চাপ দেয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে ২৩ মার্চ শেখ মুজিবের ধানমণ্ডির বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। এর মাঝে ভুট্টোও ঢাকা এসে পৌঁছেছিলেন। ২৫ মার্চ তাঁর সাথে এক রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসেন ইয়াহিয়া। ঐদিনই সন্ধ্যায় তড়িঘড়ি করে তাঁরা দুজন ঢাকা ত্যাগ করে ইসলামাবাদ ফিরে যান।

হঠাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেলেন কেন, তা বুঝে ওঠার আগেই ২৬ মার্চ রাত ১.১০ মিনিটের সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। আর তার পরপরই একসাথে আক্রমণ চালানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, প্রতিটি থানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও ইপিআর ঘাঁটিতে। এমনকি ফুটপাতে ঘুমন্ত মানুষও রেহাই পায় না পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর আক্রমণ থেকে। অতি দ্রুত এ আক্রমণ ছড়িয়ে দেয়া হয় পুরো দেশ জুড়ে। সেই কালো রাতেই বঙ্গবন্ধুকে এক বিশেষ বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

দেশের এই চরম পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও অন্য বড় দলগুলোর নেতারা নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করেন। কেউ কেউ আশ্রয় নেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা বেশিরভাগই পাকবাহিনীর হাতে শহীদ হন। কেউ কেউ পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।



স্বাধীনতার আগেই যাঁর হাতে দেশের শাসনভার

১৯৭১ সালে বহির্বিশ্বে অন্যতম আলোচিত ও আলোড়িত ব্যক্তি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আর দেশের ভেতরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্বাধীনতার প্রতীক ও প্রেরণা। মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতাসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যান চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। তাঁর আহূত অসহযোগ আন্দোলন আর অসহযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সে আন্দোলন রূপ নেয় বিশাল গণবিদ্রোহে। সেই বিদ্রোহকালীন অবস্থায়ও জনগণকে শান্ত রাখা এবং সামনে চলার কাজটি সুচারুভাবে করেছিলেন তিনি। সাতই মার্চের ভাষণই হয়ে ওঠে দিকনির্দেশনা। দেশবাসী তো বটেই, বিদেশি রাষ্ট্রনেতা, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরাও অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন একজন ব্যক্তি প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছাড়াই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করছেন। তাঁর প্রতিটি আদেশ-নির্দেশ জনগণ সানন্দে মেনে নিচ্ছে, তাঁর কথায় লাখ লাখ তরুণ জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি দল-মতনির্বিশেষে সবাইকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। এটা ছিল এ ভূখণ্ডের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতা খান আবদুল ওয়ালি খান মার্চে ঢাকায় আসেন। পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'মহাত্মা গান্ধী আজ বেঁচে থাকলে বিস্মিত হতেন।' সে সময়ে শেখ মুজিব ছিলেন সত্যি বিস্ময়। যেসব বিদেশি সাংবাদিক পেশাগত দায়িত্ব পালনে ঢাকায় এসেছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন গভর্নর ভবন নয়, সচিবালয় নয়, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দোতলা বাড়িটি থেকে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী, সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে হাইকোর্টের বিচারকেরা পর্যন্ত সেখানে এসে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ দিচ্ছেন।

সে সময় একটি কথা বেশ প্রচলিত হয়েছিল All roads lead to 32. সব সড়কই মিলেছে ৩২ নম্বরে।এমনকি পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান, পিপল'স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও মার্চের বাংলাদেশ দেখে বুঝে নিয়েছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারপরও বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী কামান ও ট্যাংকের তলায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার আকা্ক্ষা গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। সেটা ছিল তাদের মস্ত বড় আহাম্মকি। একটা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী যখন শাসকদের বিরুদ্ধে যায়, তখণ তাকে কোনোভাবেই দমিয়ে রাখা যায় না। পাকিস্তানি মারণাস্ত্র হয়তো বিজয়কে কিছুটা বিলম্বিত করেছে, লাখো লাখো জীবন কেড়ে নিয়েছে; কিন্তু তার জন্য পাকিস্তানকেও কম খেসারত দিতে হয়নি। ২৬ মার্চ ঢাকা থেকে করাচি ফিরে গিয়ে ভুট্টো বলেছিলেন, 'God Save Pakistan।' কিন্তু তার আগেই পাকিস্তান ভেঙে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যথার্থই বলেছিলেন, "পাকিস্তান আজ মৃত। অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে।"

পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তী নয় মাস তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে কারারুদ্ধ। কিন্তু সেই কারারুদ্ধ শেখ মুজিব অনেক বেশি ভীতি ও শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ান পাকিস্তানি শাসক চক্রের কাছে। ২৬ মার্চ বেতার-টিভিতে দেওয়া ভাষণে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। নিষিদ্ধ করেন তাঁর দল আওয়ামী লীগকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে যে পৈশাচিক গণহত্যা চালায়, তা বিদেশি পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর বিশ্ব সম্প্রদায় পাকস্তিানি শাসকদের ধিক্কার দিতে থাকে। তাদের প্রশ্ন ছিল জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কেন পার্লামেন্টে বসতে দেওয়া হলো না? কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে কারাগারে পাঠানো হলো? এসব প্রশ্নের জবাব ইয়াহিয়া-ভুট্টোর জানা ছিল না।

সে সময় বিশ্বজনমত, রাষ্ট্রনেতা তথা গণমাধ্যমগুলো কীভাবে বাঙালি নেতা শেখ মুজিবকে মূল্যায়ন করেছে, তার কিছু বিবরণ এ

লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করব। এপ্রিলের ২ তারিখে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস পদগোর্নি ইয়াহিয়া খানকে লেখা চিঠিতে বলেন, 'ঢাকার আলোচনা ভেঙে যাওয়া এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে সামরিক বলপ্রয়োগ করেছেন– এ খবরে সোভিয়েত ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। ... অগণিত মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখ-কষ্টের খবরে সোভিয়েত জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য রাজনীতিককে বন্দী ও নির্যাতন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে।'

আমরা জানি, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। বিশেষ করে তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন জবরদখলকারী পাকিস্তানি শাসকদের ঘোরতর সমর্থক। কিন্তু বহু ডেমোক্রেট-রিপাবলিকান সিনেটর ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। এডওয়ার্ড কেনেডি শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্ধশা দেখতে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন।

একাত্তরে ঢাকায় মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল ছিলেন আর্চার কে ব্লাড। তিনি সে সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরে, তাতে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত হয়েছিল। রিপোর্টের একাংশে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা এখন অপরিহার্য। অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিল, পূর্ব পাকিস্তানি জনসাধারণের ওপর সামগ্রিক লাঞ্ছনার জন্য শিগগিরই তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে– বাংলাদেশ এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। এখানকার বর্তমান সংঘর্ষের পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতি, ভাষা ও সামাজিক চালিকাশক্তিগুলোর প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত রয়েছে। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের নীতিমালা গত নির্বাচনে জনগণের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে সমর্থিত হয়েছে। এই ঘটনা অর্থনৈতিক নীতির ওপর প্রদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত ক্ষমতার সংশোধনকেই জোরদার করেছে, যার প্রতিক্রিয়ায় ইয়াহিয়া সরকার একটি আতঙ্কের রাজত্ব স্থাপন

করতে যাচ্ছে, এতে পুরো চেহারা ধীরে ধীরে সবার কাছেই উন্মোচিত হবে।'

সে সময় পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন ফারল্যান্ড। সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার সঙ্গেও তাঁর দোস্তি ছিল। শুরুতে তিনিও শেখ মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানি শাসকদের একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়নি। তবে ফারল্যান্ড দাবি করেন যে শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে না ঝোলানোর ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানকে তিনি প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া কি প্রভাবিত হয়েছিলেন? এ সম্পর্কে মার্কিন সাংবাদিক জ্যাক এন্ডারসন ফারল্যান্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন :

যখন এই যুদ্ধের ওপর ইতিহাস লেখা হবে, তাতে দেখা যাবে যে মার্কিন নীতি এবং পাকিস্তানে আমাদের স্থানীয় প্রচেষ্টা মুজিবকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মুজিব গ্রেপ্তার হওয়ার পর আমি ঘন ঘন ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতাম এবং প্রায়ই মুজিবের কথা উল্লেখ করতাম। আমি ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিতাম এই মানুষটিকে হত্যা কোরো না। ইয়াহিয়া তাতে খুব প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না, তিনি মুজিবকে একেবারেই ছেড়ে দেবেন এমনটি নয়। যুদ্ধের পর যখন ইয়াহিয়া অপমানজনকভাবে অফিস ত্যাগ করেন, তখন তিনি মুজিবের মৃত্যু পরোয়ানাটি রেখে যান। কিন্তু তারিখের ঘরটি ছিল ফাঁকা। তিনি তাঁর উত্তরসূরি ইয়াহিয়ার ওপর দায় চাপিয়ে এটি কার্যকর করতে পারতেন। ইয়াহিয়ার উত্তরসূরি সেই পরোয়ানা ব্যবহার না করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। (সূত্র : জ্যাক অ্যান্ডারসন্স পেপারস)

মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ আগস্ট মাসে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি কারাগারে আটক বাঙালি নেতা শেখ মুজিবের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। বিচার চলে সামরিক আদালতে এবং গোপনে। এর আগেই তিনি ঘোষণা করেছেন, 'শেখ মুজিব যে অপরাধ করেছেন, সে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।' ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় বিশ্ব নেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

২ আগস্ট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দপ্তর থেকে প্রচারিত প্রেসনোটে বলা হয়, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও

অন্যান্য অপরাধের জন্য বিশেষ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার করা হবে। ১১ আগস্ট রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার কাজ শুরু হবে এবং কার্যবিবরণী সেখানে রাখা হবে। অভিযুক্তকে তাঁর পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে এবং নিজ পছন্দ অনুযায়ী কৌঁসুলি নিয়োগের (অবশ্যই তাঁকে পাকিস্তানি নাগরিক হতে হবে) সুযোগসহ নিয়ম অনুযায়ী অন্য সব সুবিধা দেওয়া হবে।' কিন্তু পাকিস্তান সরকারের এই বিচারের কোনো নৈতিক বা আইনগত অধিকারই ছিল না।

বিচারের খবর প্রচারের পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ত্বরিত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, শেখ মুজিবের প্রহসনমূলক বিচার অনুষ্ঠান মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং গোটা বিশ্ব এর বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ২৪টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের কছে চিঠি লেখেন। যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, শেখ মুজিবের যেকোনো বিচারের সংক্ষিপ্ত আয়োজন পূর্ব বাংলার সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা তিরোহিত করবে।

তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, ১৩ আগস্ট ২০১৬

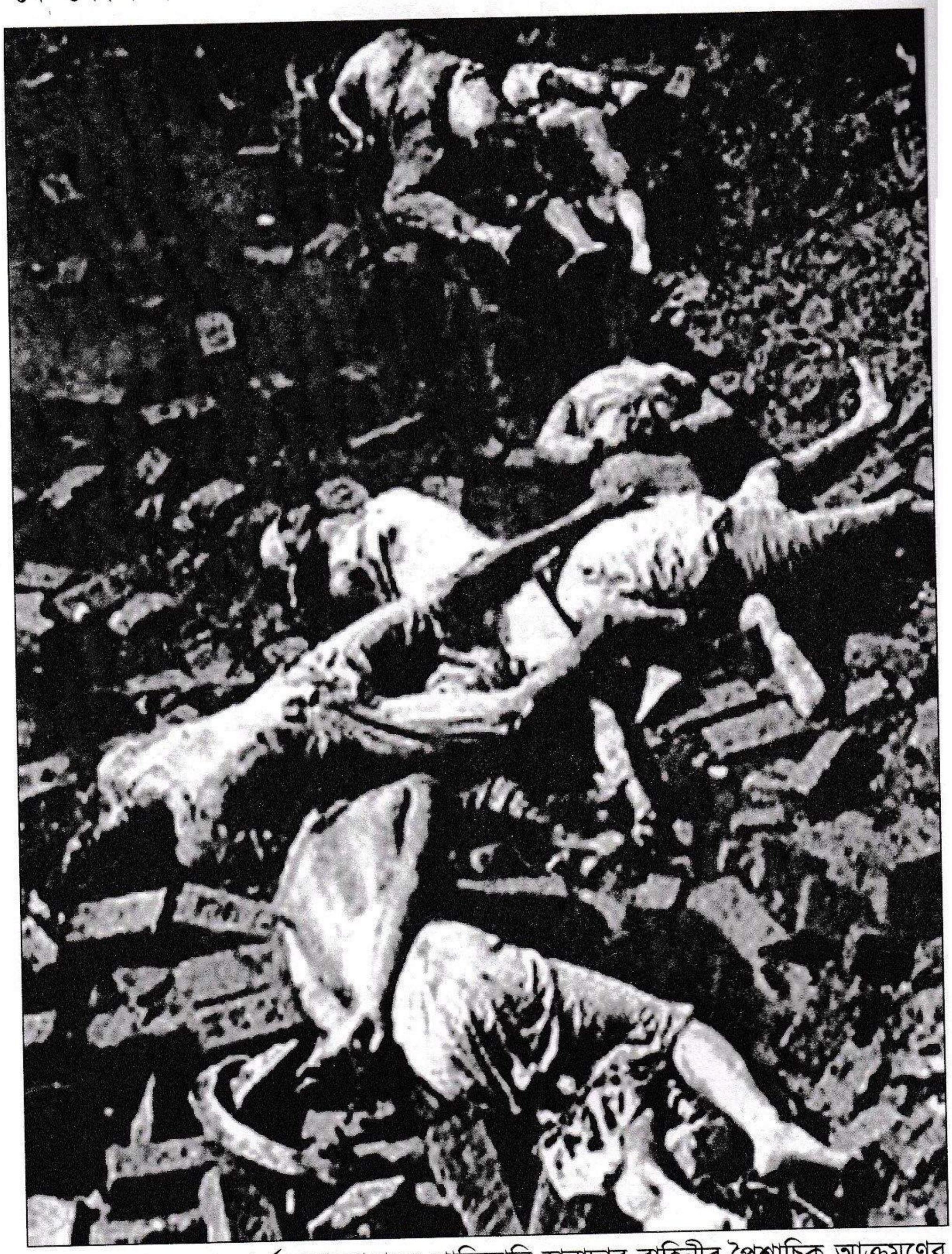


২৫ মার্চের কালোরাতে নিরীহ বাঙালিদের উপর পাকবাহিনীর আক্রমণ

১৯৭১-এর ২৫ মার্চের কালোরাতে পাকসেনাবাহিনী শুরু করে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। বাঙালি নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে তারা। এদিন থেকে পাকবাহিনী যে ভয়ঙ্কর গণহত্যা শুরু করে তা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যাপক, নৃশংস ও জঘন্যতম গণহত্যা। ২৫ মার্চ রাতেই তারা ঢাকাতে হত্যা করে হাজার হাজার নিরীহ বাঙালি। এদের মধ্যে ছিল ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর, রিকশাচালক, বস্তিবাসীসহ সর্বস্তরের জনগণ। পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, গণহত্যার ব্যাপকতা ছিল বাঙালিদের চিন্তার বাইরে। শুধু বাঙালিরা নয়, পাক বাহিনীর জঘন্যত হত্যাকাণ্ডে সমগ্র পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষই স্তম্ভিত হয়ে যায়। শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র বাংলাদেশেই শুরু হয় তাদের এ গণহত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারীধর্ষণ এবং তা অব্যাহত ছিল নয় মাসব্যাপী– '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনতে যে প্রধান যুদ্ধকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল, তা হলো গেরিলা যুদ্ধকৌশল। যার মূল করণীয় ছিল লুক্কায়িত অবস্থান থেকে শত্রুকে আচমকা আঘাত হানো এবং দ্রুত আত্মগোপন/পলায়ন করো। এই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন কারাবন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। আর প্রধান সেনাপতি ছিলেন (অবসরপ্রাপ্ত) কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। সমভূমি, নদী ও পাহাড়মাতৃক বাংলাদেশের ভৌগলিক নিসর্গকে বিবেচনায় এনে একে ১১টি সেক্টর এবং ৬৫টি সাবক্টেরে ভাগ করা হয়। ১৫জন সামরিক কর্মকর্তা সেক্টর কমান্ডার এবং ৭৫ জন সামরিক কর্মকর্তা সাব-সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে হতে তিন জনের নামে তাদের নামের আদ্যক্ষরে ব্রিগেড আকারে ফোর্স গঠন করা হয়। মেজর জিয়াউর রহমানের

নামানুসারে 'জেড ফোর্স', মেজর আলী মোহাম্মদ শফিউল্লার নামানুসারে 'এস ফোস' এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামানুষারে 'কে ফোস'।



১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালোরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক আক্রমণের শিকার নিরীহ বাঙালির মরদেহ



এবারের সংগ্রাম আমাদের দেশ গড়ার সংগ্রাম

এই সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার সাহসী সন্তানেরা। এদিকে লাখ লাখ বাঙালি ঘরবাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নেয় ভারতের বিভিন্ন শিবিরে। ভারত সব ধরনের সাহায্য নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়–এসে দাঁড়ায় বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার আক্রমণে নয় মাসের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজয়বরণ করে পাকবাহিনী। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনো বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। এর মাঝে পাক সরকার তাঁকে বিচারের সম্মুখীনও করেছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে চরম কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সাহস পায়নি তারা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে। ১৯৭২ সালের ৩ মার্চ তিনি ঘোষণা করেন যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর সরকার মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেবে। সত্যি সত্যিই ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয়া হয় বঙ্গবন্ধুকে। পাকিস্তান থেকে প্রথম তিনি যান লন্ডন। সেখানে একদিন থাকার পর ১০ জানুয়ারি ঢাকায় ফিরে আসেন তিনি। দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের সময় বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী বিমান ঢাকা বিমানবন্দরে এসে গেছে। ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নেয়া হয় সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংসদীয় সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। সংবিধান রচনার জন্যে গঠন করা হয় ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি। ৪ নভেম্বর জাতীয় পরিষদে খসড়া সংবিধান অনুমোদন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু এক বিধ্বস্ত দেশের ক্ষমতায় আসীন হয়ে হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হন। সব সমস্যা এত সীমাবদ্ধ সম্পদ নিয়ে এত দ্রুত সমাধা করা সম্ভবও নয়। তাছাড়া সে সময় তিনি যেসব সহকর্মীকে সৎ এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে পেয়েছিলেন, তাও নয়। কিন্তু মানুষের প্রত্যাশা ছিল তাঁর কাছে অনেক। তার ওপর বিরুদ্ধবাদীদের উস্কানি তো ছিলই।



এমন অবস্থায় ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। এই নির্বাচনে আবার তাঁর দল ক্ষমতায় আসে। আবার তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন।

১৯৭৪ সাল বঙ্গবন্ধুর জীবনে নানাভাবে স্মরণীয়। এ বছর পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধু লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ বছরের শেষের দিকে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েত সফর করেন। একই বছর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধু সরকার প্রধান হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় যোগদান করেন এবং মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন।



পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু

পঁচিশে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গবন্ধু আগেই পাকিস্তানি সামরিক জান্তার এই আক্রমণ সম্বন্ধে ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে নিশ্চিহ্ন ও নেতৃত্বহীন করতে ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে মেজর জেনারেল খাদিম এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। আলোচনাকালেই বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের জন্য তালিকা প্রণয়ন করা হয়। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, জেনারেল ওসমানি, সিরাজুল আলম খান, আতাউর রহমান খান, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, অলি আহাদ, মতিয়া চৌধুরী। এই পরিকল্পনা অনুমোদন করে প্রেসিডেন্ট গোপনে ঢাকা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার তাঁর অফিস থেকে প্রেসিডেন্টের বিমানে ওঠার দৃশ্য দেখে ফেলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদ বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেন। রাত ১২টায় কন্যাদ্বয় এবং জামাতা ড. আবদুল ওয়াজেদ মিয়া বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র ভাড়া করা বাসায় ওঠেন। রাত ১.৩০টায় পাকিস্তানি সেনারা বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার পর্বে ছিল উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত এবং নাটকীয়তা। এই অতীব গুরুতর দায়িত্ব পেয়েছিলেন পাকিস্তানি মেজর বিলাল। রাত দেড়টার সময় তিনি এটা সমাধা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অধীনে ছিল একটা ট্যাংক, একটা এপিসি এবং কয়েক ট্রাক বোঝাই সৈনিক। তিনি তাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন ধানমন্ডির দিকে। রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড ও বাধা অক্রিম করে বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবের বাড়ির সামনে এসে তাঁরা

সবাই থামল। সেই বাড়িটি তাক করে প্রায় সব সৈনিক মিলে কিছুক্ষণ গুলি চালাল।

কয়েকটি গুলি এসে লাগল ছাদে এবং ওপরতলার জানালা ভেদ করে ঘরে। রবার্ট পেইন লিখেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান তখন শয্যায় ছিলেন। গোলাগুলির আওয়াজ পেয়ে তিনি উঠে স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে ঠেলে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিলেন। প্রায় একশ সৈন্য বাড়িটি ঘিরে রেখেছিল এবং এমনি অসম শক্তি-সমাবেশ প্রমাণ করে যে, সেনাবাহিনী মনে করেছিল বাড়িটিকে দুর্গ করে তোলা হয়েছে। গোটা বাড়ি যখন ঘিরে ফেলা হলো তখনও সৈন্যরা আকাশে গুলি ছুঁড়ছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে, নিরস্ত্র রাজনৈতিক এক নেতার বাড়ি এরূপ সশস্ত্র সেনাবাহিনীর লোকেরা ঘেরাও করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন পাকিস্তানিদের মূল চিন্তার কারণ।

জেনারেল টিক্কা খানের এডিসি মেজর (অব.) এস. জি জিলানির ভাষ্যমতে, 'গ্রেপ্তারের পর শেখ মুজিবকে রাখা হয়েছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। তিনি ছিলেন অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বন্দি। পাকিস্তানি বাহিনীর ভয় ছিল যে, হযতো, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র, বিশেষভাবে ভারত, তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার চেষ্টা নিতে পারে। এ জন্য তাঁর অবস্থান গোপন রাখা হয়েছিল এবং এক জায়গাতেও তাঁকে রাখা হতো না। তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাবার ব্যবস্থা দুবার বাতিল করা হয়েছিল এই ভয় থেকে যে, খবরটা ভারতে পাচার হযে গেছে এবং মধ্য আকাশে বিমানকে ভারত ধাওয়া করতে পারে। তাঁর বাড়ি থেকে তুলে মুজিবকে নেওয়া হয়েছিল নির্মীয়মান জাতীয় সংসদ ভবনে। নিয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর আবার বঙ্গবন্ধুর বাসায় আরেকটি আর্মি ট্রাক আসে। এবারকার সৈনিকদের দায়িত্ব ছিল ভিন্নতর। তারা এসেছে বাড়িটি ধ্বংস করতে। তারা অর্পিত দায়িত্বটি দখলদার বাহিনীর মতোই সমাধা করে।

বঙ্গবন্ধুকে ২৫ মার্চ গ্রেপ্তারের পর তাঁর ঢাকার বাসভবন যেমন তছনছ করা হয়, তেমনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়িটিও রেহাই পায়নি ঘাতকদের ধ্বংসলীলা থেকে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু ডেভিড ফ্রস্টকে বলেছিলেন যে, তিনি দেশপ্রেমিকদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বর্বররা তাঁকে গ্রেপ্তারের পর

তাঁর প্রিয় বাড়িঘর ছারখার করে দেয়। তাঁর নব্বই বছরের পিতা ও আশি বছরের মাতা, উভয়েই থাকতেন গ্রামের কেন্দ্রস্থলে সেই প্রিয় বাড়িতে। সৈন্যরা বাবা-মাকে টেনে ঘর থেকে বের করে তাঁদের সামনে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাঁদের আশ্রয়হীন করে দেয়।"

সাংবাদিক আমীর তাহেরি জেনারেল টিক্কা খানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করেছিলেন কেন?' টিক্কা খান জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার কো-অর্ডিনেশন অফিসার একটি তিন ব্যান্ড রেডিও নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, স্যার শুনুন। শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন।' আমি নিজে রেডিওর এক বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে সেই স্বাধীনতার ঘোষণা শুনি।...তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। সাংবাদিক আরও জানতে চাইলেন, 'তাজউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে শেখ মুজিবও যদি ভারতে যেতেন তবে সেক্ষেত্রে আপনি কি করতেন স্যার?' উত্তরে টিক্কা খান বলেছিলেন, 'আমি খুব ভালো করে জানি মুজিবের মতো একজন নেতা তাঁর জনগণকে পরিত্যাগ করবে না। আমি গোটা ঢাকা শহরে তাঁকে খুঁজে বেড়াতাম এবং একটি বাড়িও তল্লাশির বাইরে রাখতাম না। তাজউদ্দীন অথবা তাঁর মতো অন্য নেতাদের গ্রেপ্তারের কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। সে কারণেই তাঁরা এত সহজে ঢাকা ছেড়ে যেতে পেরেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তিনদিন পরে অর্থাৎ ২৯ মার্চ প্লেনে করে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানের কারাভ্যন্তরে তিনি বন্দি ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন জানতেন না তিনি কোন শহরে আছেন। কেবল জানতেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাঁকে বন্দি করে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে রেখেছে। পাহারাদার তাঁর খাবার নিয়ে আসে এবং তারপর তা রেখে যাদুর মতো উধাও হয়ে যায়। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সংকীর্ণ কুঠুরিতে অন্তহীন ভাবনারাজির মধ্যে নিঃসঙ্গ সময় কাটাতেন আর অপেক্ষা করতেন সেই মুহূর্তটির জন্য, যখনহঠাৎ করে খুলে যাবে সেলের দরজা এবং সামনে এসে দাঁড়াবে মেশিনগান হাতে সৈনিক।

তিনি যে একজন গুরুত্বপূর্ণ বন্দি এবং তাঁর আয়ু আর বেশি দিন নেই এমনভাবেই কারাপ্রহরীরা জানত। কারা কর্তৃপক্ষ প্রতি সপ্তাহে

বন্দির আচার-আচরণ সম্পর্কে ইসলামাবাদে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাত। এই রিপার্টে উল্লেখ থাকত তিনি কি খাবার খেয়েছেন, তিনি কেমন ঘুমিয়েছেন, সেলের মধ্যে এ-দেয়াল থেকে ও দেয়াল অবধি পায়চারি করেছেন কি করেননি। বন্দির কথাবার্তা সম্পর্কে জানতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খুব উৎসুক ছিলেন।

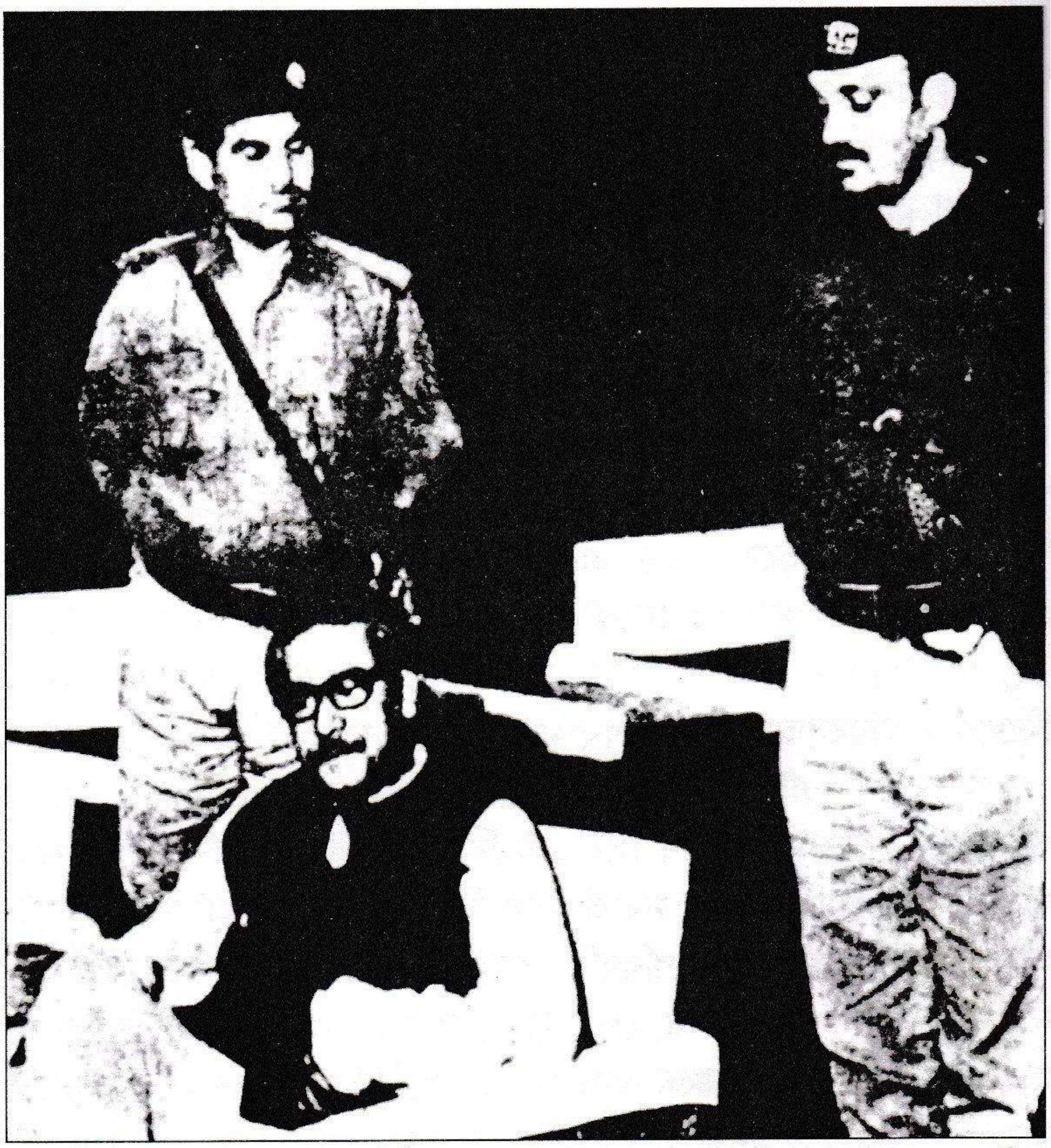
বাংলাদেশে কী ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কিছুই জানতেন না। তবে তিনি ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে, সামরিক একনায়কের খেয়ালখুশির ওপর তাঁর জীবন নির্ভর করছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলাম। একজন মানুষ যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে, তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে না।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, ইয়াহিয়ার সৈন্যরা যদি পূর্ব পাকিস্তান দখলে নিয়ে আসতে পারে, আওয়ামী লীগের যদি বিপর্যয় ঘটে, তবে তাঁকে হত্যা করা হবে। জিম্মি হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোনো কার্যকারিতা ইয়াহিয়া খানের কাছে থাকবে, তাঁকে ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা হবে।

ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান টেলিভিশনে ৩ আগস্ট, ১৯৭১ ঘোষণা করেন যে, "শেখ মুজিবের বিচার করা হবে এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের আইন অনুসারে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা হবে।" ইয়াহিয়া বলেন যে, মুজিবের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো বিদ্বেষ নেই। তিনি বরং মুজিবের জন্য দুঃখ অনুভব করেন। কেননা কৃতকর্মের সাজা তো তাঁকে পেতেই হবে। এর একদিন আগে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলা হয়েছিল যে, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' ও অন্যান্য অপরাধের জন্য বিশেষ সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার করা হবে।'

বিশ্বব্যাপী এই বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী শরণ সিং এই বিষয়ে ত্বরিত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন এবং পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, মুজিবের কোর্ট মার্শাল করা হলে এর পরিণতি হবে গুরুতর। লোকসভায় ভাষণ দানকালে শরণ সিং বলেন, শেখ মুজিবের প্রহসনমূলক বিচার-অনুষ্ঠান মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং গোটা বিশ্ব দ্বারা নিন্দিত হওয়ার দাবি রাখে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চব্বিশটি দেশের কাছে

আবেদন জানান শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার্থে কিছু একটা করার জন্য। পাকিস্তান সরকারের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো উদ্বেগ প্রকাশ করে।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বাঙালিরা জানত না তাঁদের মক্তিদাতা ও অবিসংবাদিত নেতা মৃত না জীবিত। তাদের কাছে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের ত্রাণকর্তা, জীবিত মৃত যাই হোন না কেন। বেঁচে থাকতেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তির মহানায়ক যদিও তখন তিনি নীরব, দৃশ্যগোচর নন এবং বহু দূরে বন্দি। তবুও তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির আবালবৃদ্ধবনিতার নয়নমণি, মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু যিনি বাংলাদেশকে দিয়েছেন দিকনির্দেশনা, আধুনিক অর্থে একটি জাতি রাষ্ট্রের ধারণা। অনুপস্থিত ছিলেন বলেই শেক মুজিবুর রহমান



২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত অবস্থায় করাচি বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু

আরও বেশি করে বিদ্যমান ছিলেন সবার মনে। তাঁরা লড়েছিল তাঁর নাম উচ্চারণ করে, মৃত্যুবরণও করেছিল তাঁর নাম উচ্চারণ করে। 'নয়ন সমুখে তুমি নেই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই' গানের কলির মতো বঙ্গবন্ধুর অবস্থান। জীবিত জুলিয়াস সিজার যত না শক্তিশালী ছিলেন তার চেয়ে শত সহস্র গুণে তাঁর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুর পর। তেমনি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি বাঙালি জাতিকে নিরুৎসাহিত তো করতে পারেইনি বরং আরো উজ্জীবিত করেছে। কারাগারে বন্দি থেকেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর নামেই পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্য সমগ্র পৃথিবীর মানুষ উৎকণ্ঠিত ছিল।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজি যখন আত্মসমর্পণ করছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা-কুঠুরিতে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন... বন্দিকে ফাঁসি দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ইয়াহিয়া খান কারা কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য বিশেষ টেলিগ্রাম যাবে তাদের কাছে। কিন্তু সে বিশেষ টেলিগ্রাম আর পাঠানো হলো না।

বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবকে হত্যা করার চিন্তাটা ইয়াহিয়াকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মুজিবের নিজের ভাষ্যে : "ভুট্টো আমাকে জানিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া খান যখন তাঁকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন যে, মুজিবকে শুরুতে না মেরে তিনি মহা ভুল করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, এখন আপনাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে অনুগ্রহ করে পেছনের তারিখ দিয়ে নির্দেশ জারি করে মুজিবকে মেরে ফেলার সুযোগ আমাকে দিন। কিন্তু ভুট্টো এতে সম্মত হননি।"



১৯৭১-এর ডিসেম্বরের দিনগুলি

৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তিবাহিনী যশোর, বরিশাল ও পটুয়াখালী দখল করে এবং বেসামরিক প্রশাসন চালু করে। এছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে পাকবাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ৯ই ডিসেম্বর গভর্নর মালিকের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলে জেনারেল নিয়াজী তা প্রত্যাখ্যান করেন। মিত্রবাহিনীর পক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকাশ যুদ্ধরত পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। এবং তা আকাশবানীর সমস্ত কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হতে থাকে। ১৩ই ডিসেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া খানও আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। জেনারেল নিয়াজী শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

১৪ই ডিসেম্বর গভর্নর ডা. মালিক সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্যে গভর্নর হাউজে উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠক ডাকেন। কিন্তু সভা চলাকালীন সময়ে গভর্নর হউজের ওপর উপর্যুপরী বিমান হামলা হতে থাকলে ডা. মালিক ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রেডক্রসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৪ই ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ঢাকার ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান নেয়। জেনারেল মানেকাশ ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টার মধ্যে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। ইতিমধ্যে দুই নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর হায়দার ১৬ই ডিসেম্বর ডেমরা হয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের জন্য ৬ ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। ঐ দিন মিরপুর ব্রিজের কাছে মেজর জেনারেল নাগরা এবং কাদেরীয়া বাহিনীসহ কাদের সিদ্দিকী এসে অবস্থান নেন। পাকস্তিানের ৩৫ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ সশরীরে তাদের কাছে আত্মসমর্পণের কথা



১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস

জানান। পরিস্থিতি এমনভাবে মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর অনুকূলে চলে যায় যে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৯টায় জেনারেল নিয়াজী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত জানাতে বাধ্য হন।

১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪-২১ মিনিটে ঐতিহাসিক রমনা রেসকোর্স ময়দানে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যসহ জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসর্পণের সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণ ও নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নতুন একটি দেশ বাংলাদেশ।

আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surreender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and srrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meanong of interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection woll be provided to foreing nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJT SINGH AURORA.

Jagjit Singh

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in chief
India and Bangladesh Forces in the
Eastern Theatre
16 December1971.

AAK Niazi Lt Gen

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command
(Pakistan)
16 December 1971.

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : পাক বাহিনী কর্তৃক মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমপর্ণের প্রমাণ স্বাক্ষরিত দলিলের প্রতিলিপি



কাপুরুষ পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য



১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে, আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদানরত পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজী। পাশে যৌথ বাহিনীর কমান্ডার লে. জেনারেল অরোরা, গ্রুফ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার ও অন্যান্য

আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিল

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড বাংলাদেশে পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সব সৈনিকদেরকে পূর্ব-রণ নিয়োজিত ভারতীয় ও বাংলাদেশি যৌথবাহিনীর সর্বপ্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে ও করাইতে রাজী হয়। এই আত্মসমর্পণে পাকিস্তানের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনী এবং সর্ব আধাসামরিক বাহিনী ও বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনীও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। এই সমস্ত সেনাদল বর্তমানে যেখানে আছে সেখানে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনস্থ নিয়মিত সেনাদলের নিকট অস্ত্রসমপূর্ণপূর্বক আত্মসমর্পণ করিবে।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড এই দলিল স্বাক্ষর করিবার সাথে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার আদেশভুক্ত হইবে। আদেশ পালনে অবাধ্যতা আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গ বলিয়া বিবেচতি হইবে এবং যুদ্ধের স্বীকৃত আইন ও ধারামতে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর কোনোরূপ ব্যাখ্যার বা অর্থের কোনো সন্দেহ দেখা দিলে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা পবিত্র আশ্বাস প্রদান করিলেন যে যাহারা আত্মসমর্পণ করিবে তাহাদিগকে জেনেভা চুক্তির শর্তানুসারে নম্র ও ভদ্র আচরণের মধ্যে রাখা হইবে এবং আত্মসমর্পণকৃত পাকিস্তানি সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সৈনিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করিবে। লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনস্থ বাহিনী কর্তৃক বিদেশি নাগরিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং জন্মগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানি নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া হইবে।

স্বা/-

(জগজিৎ সিং অরোরা)
লে. জেনারেল
পূর্ব-রণ ভারতও বাংলাদেশ
রণাঙ্গণের অধিনায়ক
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

স্বা/-

(আমীর অ াবদুল্লাহ খান নিয়াজী)
লে. জেনারেল
'খ' অঞ্চলীয় মার্শাল'ল' প্রশাসক এবং
পূর্ব পাকিস্তান বাহিনীর সেনাপতি
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ : হানাদার বাহিনী কর্তৃক মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের প্রমাণ স্বাক্ষরিত দলিলের অনুবাদিত প্রতিলিপি।



বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী পিআইএ'র বিমানটি ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ সকাল সাড়ে ছ'টায় লন্ডন হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছে। ইতোপূর্বে বিমান পাইলটের মাধ্যমে লন্ডনে রেডিওবার্তা পাঠানো হয়েছিল। এর সূত্র ধরে সেদিন প্রত্যুষে ব্রিটিশ ও বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হন।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে নিজ বাসভূমে ফিরে এলেন। লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে তাঁকে বহনকারী ব্রিটিশ কমেট বিমানটি তেজগাঁও বিমানবন্দর স্পর্শ করে বিকেল ৩টায়। একুশবার তোপধ্বনি আর লাখো মানুষের আনন্দোল্লাসের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বরণ করল তার প্রিয় স্বদেশভূমি। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ বাঙালির ভালোবাসা আর স্নেহের পরশ ভেদ করে পৌঁছাতে তাঁর সময় লেগেছিল আড়াই ঘণ্টা।

সেদিন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, বারংবার তাঁর দুই চোখ গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর অন্তর ছিল আবেগে আপ্লুত এবং চোখ ছিল আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত। তার মাঝেও লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে তিনি যে ভাষণ দান করেন তার সিংহভাগ জুড়েই ছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের ছবি। সেই ভাষণে তিনি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পুনর্গঠন কাজটিকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিশেষ করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশকে সম্মিলিত উদ্যোগে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে বারবার। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন সেই পুনর্গঠন কাজ পরিচালিত হবে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন :

আমার বাংলায় আজ বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে। ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে। আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট

করেছেন। আমাকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা। বাংলার এক কোটি লোক প্রাণ ভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটিশ, জার্মান, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ মার্চ আমি এই রেসকোর্সে বলেছিলাম 'দুর্গ গড়ে তোলো'। আজ আবার বলছি আপনারা একতা বজায় রাখুন। আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'। বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। একজন বাঙালি বেঁচে থাকতেও এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবো না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশরূপেই বেঁচে থাকবে। বাংলাকে দাবায়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নাই।...

গত দশ মাসে সেনাবাহিনী বাংলাকে বিরান করেছে। বাংলার লাখো মানুষের আজ খাবার নাই, অসংখ্য লোক গৃহহারা। এদের জন্য



১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জনতার বিশাল সংবর্ধনামঞ্চে বঙ্গবন্ধু

মানবতার খাতিরে আমরা সাহায্য চাই। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আমি সাহায্যের আবেদন জানাই। বিশ্বের সকল মুক্ত রাষ্ট্রকে অনুরোধ করছি–বাংলাকে স্বীকৃতি দিন। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় অত্যন্ত ভালোবাসি।

আমি প্রেসিডেন্ট হিসাবে নয়, নেতা হিসেবে নয়, আপনাদের ভাই হিসেবে বলছি–যদি দেশবাসী খাবার না পায়, যুবকরা চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে–পূর্ণ হবে না। তোমরা, আমার ভাইয়েরা, গেরিলা হয়েছিলে দেশমাতার মুক্তির জন্য। তোমরা রক্ত দিয়েছো। তোমাদের রক্ত বৃথা যাবে না।...

বাংলাদেশ আজ মুক্ত, স্বাধীন। কিন্তু আজ আমাদের সামনে অসংখ্য সমস্যা আছে, যার আশু সমাধান প্রয়োজন। বিধ্বস্ত বাংলাকে নতুন করে গড়ে তুলুন। নিজেরা সবাই রাস্তা তৈরি করতে শুরু করুন। যার যার কাজ করে যান।

সকলে জেনে রাখুন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। ইন্দেনেশিয়া প্রথম ও ভারত তৃতীয়। বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয়-ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অংশগ্রহণকারী সকল শ্রেণির জনতাকে আমি পরম কৃতজ্ঞতার সাথে সালাম জানাই। আমি সালাম জানাই–মুক্তি বাহিনীকে, গেরিলা বাহিনীকে, কর্মী বাহিনীকে। আমি সালাম জানাই–সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণিকে, কৃষককুলকে, বুদ্ধিজীবীদের।

আমি ফিরে আসার আগে ভুট্টো সাহেব অনুরোধ করেছেন, দুই অংশের মধ্যে বাঁধন সামান্য হলেও রাখা যায় কিনা। আমি তখন বলেছিলাম, আমি আমার মানুষের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। আজ আমি বলতে চাই–ভুট্টো সাহেব, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সাথে আর না। মরে যাবে, তবু বাঙালি আর স্বাধীনতা হারাতে পারে না। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আমরা স্বাধীন এটা মেনে নিন। আপনারা স্বাধীনভাবে থাকুন।



জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ভাষণ দান

১৮সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি বড় রকমের সাফল্য লাভ করে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য যেতে হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন।

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে নিজের মাতৃভাষা বাংলাতেই তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুই প্রথম যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,

জনাব সভাপতি,

আজই এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার এই যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাদীনভাবে বাঁচার অধিকার বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়েছেন, তাহারা বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্খিত ছিল। যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। আমি জানি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়িয়া তোলার জন্য বাঙালি জাতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমাদের এই অঙ্গীকারের সহিত শহিদানের বিদেহী আত্মাও মিলিত হইবে। ইহা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সক্রিয় যোদ্ধ

সভাপতি থাকাকালেই বাংলাদেশকে এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হইয়াছে। জনাব সভাপতি, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান অবদানের কথা আমি স্মরণ করিতেছি।

যাঁহাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। এই সুযোগে আমি তাঁদেরকে অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশে সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন



জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণরত বঙ্গবন্ধু

তাঁহাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁহারা আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন তাঁদেরকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের শান্তির সংগ্রাম

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম হইতেছে সার্বিক অর্থে শক্তি এবং ন্যায়ের সংগ্রাম। আর সেইজন্যই জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরে এই ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইসব নীতিমালার বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কি তীব্র সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইতেছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকান লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধার চরম আত্মদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র জাতিসংঘ সনদ স্বীকৃত পুনরুদ্ধার সম্ভব।

আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে ভূখন্ড দখল, জনগণের অধিকার হরণের জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার এবং জাতিসংঘ বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ এই সংগ্রামে বিরাট অর্জন করিয়াছে।

চূড়ান্ত বিজয়ের ইতিহাস যে জনগণ ও ন্যায়ের পক্ষেই যায়। এইসব বিজয় এই কথাই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের বহু অংশে এখনও অবিচার ও নিপীড়ন চলিতেছে, অবৈধ দখলকৃত ভূখণ্ড পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য আমাদের আরব ভাইদের সংগ্রাম অব্যাহত রহিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনী জনগণের বৈধ জাতীয় অধিকার এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। উপনিবেশ বিলোপ প্রক্রিয়ার বিশেষ করিয়া আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই সত্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জিম্বাবোয়ে (দক্ষিণ রোডেশিয়া) এবং নামিবিয়ার জনগণ জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়তার সহিত লড়াই করিয়া যাইতেছে। বর্ণবৈষম্যবাদ, যাহাকে মানবতার বিরোধী বলিয়া বার বার আখ্যায়িত করা হইয়াছে তাহা এখানে আমাদের বিবেক দংশন করা অব্যাহত রাখিয়াছে।



ছয় দশক ধরে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে বঙ্গবন্ধু

জ্যাক এন্ডারসন পেপারস সাক্ষ্য দেয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। হয়তো সেই চাপের কারণেই পাকিস্তানি শাসকেরা একাত্তরে তাঁকে হত্যা করতে সাহস পাননি। কিন্তু মৃত্যুর আগপর্যন্ত তাঁরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নানা তৎপরতা চালাতে থাকেন।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেন। কিন্তু স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট একদল বিপথগামী সেনা সপরিবারে তাঁকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে পাকিস্তানের মদদ ছিল, ঘাতকেরা পাকিস্তানি ভাবাদর্শকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা কতে চেয়েছিল; যদিও তাদের সেই প্রয়াস সফল হয়নি; কথিত সেনা অভ্যুত্থানের ৮১ দিনের মাথায় তাদের ক্ষমতা ও দেশ ছাড়তে হয়।

১৫ আগস্টের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে? অবশ্যই নয়। ঘাতকেরাও জানত, বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ কারণে মৃত্যুর পরও তারা সংঘবদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অপবাদ ও অপপ্রচার চালিয়েছে। একসময় রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র দূরে থাক, বেসরকারি গণমাধ্যমেও বঙ্গবন্ধুর নাম নেওয়া যেত না। সময়ের ব্যবধানে নিষেধাজ্ঞার সেই দেয়াল পেরিয়ে তিনি আজ বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা ও মননের প্রতীক হয়েছেন। সেদিন যারা তাঁকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, তারাই ইতিহাসের পাতায় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় যদি আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন হয়, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে বড় বিয়োগান্ত ঘটনা। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কেবল

শেখ মুজিবের দেহকেই বুলেটবিদ্ধ করা হয়নি, আঘাত করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির উপর সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পরিত্যাজ্য ঘোষিত হয়েছিল। আজ অনুকূল পরিবেশে অনেকে বঙ্গবন্ধুর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন, তাঁকে ইতিহাসের মহানায়ক হিসেবে অভিহিত করছেন; কিন্তু পঁচাত্তর-পরবর্তী সেই প্রতিকূল সময়ে কতজন তাঁর কাজের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছেন? কতজনই বা অনুধাবন করেছেন তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী অভিঘাত?

২.

দীর্ঘ ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু শেখ মুজিবুর রহমান। জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আমাদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি। তাঁর মতো আর কোনো নেতা বাঙালির আবেগ ও স্পর্ধা, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে ধারণ করতে পারেননি। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ জন পি থর্প যেমনটি বলেছেন, 'শেখ মুজিব মানুষকে ভাবাদর্শের সন্ধান দিয়েছেন। শেখ মুজিব নিজের ও তাঁর শ্রোতামণ্ডলীর রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের উত্তরণ ঘটাতে ঘটাতে পরিশেষে পাকিস্তান সেনাদের গর্জে ওঠা বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা ও সাহসে উজ্জীবিত করার জন্য জনগোষ্ঠীর প্রতীকী ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করেছিলেন।'

সমসাময়িক রাজনীতিকেরা যেখানে বারবার নীতি পরিবর্তন করেছেন, তাত্ত্বিক বিতর্কে দলকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন, সে সময় শেখ মুজিব তাঁর নীতিতে অবিচল থেকেছেন। বাঙালির মুক্তির জন্য তিনি নিয়মতান্ত্রিক ও 'নিয়মবহির্ভূত' দুই পথই বেছে নিয়েছেন। একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নেতা ও সাবেক প্রাদেশিক মন্ত্রী হয়েও ১৯৬২ সলে শেখ মুজিব আগরতলা গিয়েছিলেন পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভারতের সহায়তার জন্য। ধরা পড়লে মৃত্যু ছিল অবধারিত। সেবারে তাঁর সেই উদ্যোগ সফল না হলেও পরবর্তীকালে কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে যেসব বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা শুরু করেছিলেন, তাঁরাও ভরসা করেছিলেন শেখ মুজিবের ওপর। করাচি ও ঢাকায় তাঁর সঙ্গে একাধিক

বৈঠকও করেছেন তাঁরা। এই সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে। ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মধ্যস্থতায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ-অনিল মুখার্জিদের যে বৈঠক হয়েছিল, তাতেও তিনি স্বাধীনতার কথাই উচ্চারণ করেছিলেন। কমিউনিস্ট নেতারা বলেছিলেন, এখনো সময় আসেনি। জনগণকে প্রস্তুত করেই স্বাধীনতার কথা বলতে হবে। জবাবে মুজিব বলেছিলেন, 'দাদা, আপনাদের কথা মানলাম। কিন্তু একমত হলাম না।' অর্থাৎ শেখ মুজিব তখনই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এছাড়া ষাটের দশকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ছোট ছোট গ্রুপ সশস্ত্র পথে স্বাধীনতা লাভের কথা ভেবেছিল, তারাও শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তিনি সবাইকে উৎসাহিত করেছেন। একই সঙ্গে সাবধান করে দিয়েছেন, যাতে বিপদে না পড়ে।

৩.

ছাত্রজীবন বাদ দিলে শেখ মুজিবুর রহমানের জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হলেও ছাত্র রাজনীতিতে যোগ দেননি। তখন তাঁর চিন্তা জাতীয় রাজনীতি নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি সরকারের রোষাণলে পড়েন। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। সে সময় অনেকে মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে নিলেও মুজিব রাজি হননি। হয়ে গেলেন সার্বক্ষণিক রাজনীতিক।

দেশ বিভাগের আগেই মুসলিম লীগের দুটি ধারা ছিল। খাজা নাজিমুদ্দিন-আকরম খাঁর ধারাটি ছিল রক্ষণশীল এবং নবাব-জোতদারদের স্বার্থের রক্ষক। সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের ধারাটি ছিল উদার ও গণমানুষের কাতারে। ঢাকায় এসে মুজিব দেখলেন, সবকিছু নাজিমউদ্দিন-আকরম খাঁ চক্র দখল করে আছে। তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীদের সংগঠিত করতে থাকেন।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে যখন সরকারবিরোধী নেতা-কর্মীদের নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, তখন মুজিব জেলে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে এর সভাপতি ও শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। কারাবন্দী মুজিব হন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। এর আগে ১৯৪৮ সালের মার্চে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করতে গিয়েও তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পাকিস্তান আমলের প্রায় অর্ধেক সময়ই তিনি জেলে কাটিয়েছেন। শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হলেও বছর দুয়েকের মধ্যে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর শেখ মুজিব প্রথমে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৩ সালের সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৩ সালে মুজিব আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হন এবং ১৯৫৫ সালে দল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হলে এটি হয়ে ওঠে ধর্মনিরপেক্ষ দল। শেখ মুজিব যখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, তখন দলের সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে। আবার যখন সভাপতি হন, তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণার পর মুজিবই হয়ে ওঠেন পাকিস্তানিদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। এরপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান তাঁকে পরিণত করে জননায়কে।

৪.

৪১ বছর আগে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তিনি যেমন দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, মৃত্যুর পরও রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি সমভাবে উপস্থিত রয়েছেন। যাঁরা তাঁর অনুসারী কিংবা বিরোধী, সবার বক্তৃতা-বিবৃতি-আচরণে তাঁর প্রভাব ও ছায়া স্পষ্ট।

ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতবর্ষ এক দেশ ছিল না। একই ভাষাভাষী মানুষকে নিয়ে একেকটি রাজ্য বা অঞ্চল গড়ে উঠেছিল, যা অনেকের কাছে ছিল ' দেশ'। শেখ মুজিবের কৃতিত্ব হলো এই উপমহাদেশে ভাষাভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গঠন। এই ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র

যেমন ধর্মকে অস্বীকার করেনি, আবার ধর্মকে আশ্রয়ও করেনি। ভবিষ্যতে যদি ভারতবর্ষের মানচিত্র বদলে না যায়, তিনিই হবেন মানচিত্র বদলের সর্বশেষ নেতা। যে দুঃখী মানুষের জন্য মুজিব রাজনীতি করতেন, সেই দুঃখী মানুষের মনের ভাষাটি তিনি পড়তে পেরেছিলেন। তাদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ে গিয়েছিলেন উচ্চগ্রামে।

বাংলাদেশের বয়স ৪৫ বছর। এর মধ্যে শেখ মুজিব দেশ শাসনের সময় পেয়েছেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, সেই কাঠামো মতোই সবকিছু চলছে। তিনি গরিব কৃষকের খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন। এখনো ২৫ বিঘা পর্যন্ত যাদের জমি আছে, তাঁদের খাজনা দিতে হয় না। তিনি যে শিক্ষানীতি করেছিলেন, সেই শিক্ষানীতির চেয়ে উন্নততর কোনো শিক্ষানীতি কোনো সরকার দিতে পারেনি। তিনি যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন, সেটি খেনো উত্তম বলে বিবেচিত। তিনি যে পরিকল্পনা কমিশন করেছিলেন, সেটাই অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। পঁচাত্তরের আগে ও পরে যাঁরা শেখ মুজিবকে ভারতের দালাল বলে গালমন্দ করেছিলেন, এখন তাঁরাই দেশের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর দোহাই দিচ্ছেন। এখানেই শেখ মুজিবের মহত্ত্ব।

৫.

স্বাধীনতা-পরবর্তী এক অস্থির, অনিশ্চিত সময়ে শেখ মুজিবের জন্য দেশ পরিচালনা মোটেই সহজ ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারা নানা উপদলে বিভক্ত, কেউ কারও কথা শুনতে চাননি। অর্থনীতি বিধ্বস্ত, রাজনীতি দিগভ্রান্ত, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশ প্রচণ্ড বৈরিতার মুখোমুখি। ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে থাকলেও বিরোধিতা করেছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ। সেই প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে দেশের স্বাধীন সত্তা টিকিয়ে রাখার যে দুরূহ ও দুঃসাধ্য কাজটি তিনি করেছিলেন, অন্য কোনো নেতার পক্ষে তা সম্ভব ছিল কি না সন্দেহ।

বিএনপির নেতা মওদুদ আহমদ তাঁর শেখ মুজিবের শাসনকাল বইয়ে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের অনেক সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি শেষ পরিচ্ছদটি শেষ করেছেন যে মন্তব্য দিয়ে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, 'কারাবন্দী অবস্থায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হাতে নিহত হলে শেখ মুজিব বাঙালি জনমানসে অমর হয়ে থাকতেন এবং বাঙালি হৃদয়ে তাঁর মূর্তি থেকে যেত অবিনশ্বর। তিনি বিবেচিত হতেন ইতিহাসের মহোত্তম শহীদ হিসেবে। তবে সে ক্ষেত্রে বোধ হয় বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা আরও সকরুণ হতো। হয়তো বাংলাদেশে অনেকগুলো সরকার একসঙ্গে বিরাজ করত, ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের ঘন ঘন পরিবর্তন হতো। ... কিন্তু মুজিবের প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর পরবর্তী ভূমিকা সম্ভাব্য এই ধ্বংসের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে।' (শেখ মুজিবের শাসনকাল, মওদুদ আহমদ, ইউপিএল ১৯৮৩)

তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, ১৪ আগস্ট ২০১৬



বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন কখন দেখতে শুরু করেন?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের ভাষায়, 'সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে'। (অন্নদাশংকর রায়, ইতিহাসের মহানায়ক, প্রকাশক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১১)। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা বিদায় নিল, পাকিস্তান আর ভারত– দুটো দেশ জন্ম নিল। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হলে যুবক শেখ মুজিব ডাকলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র-যুবা কর্মীদের। বললেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। এবার আমাদের যেতে হবে বাংলা দেশের পবিত্র মাটিতে। এই স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়।'

বঙ্গবন্ধু ১৯৪৭-এ পূর্ববাংলায় ফিরেই মুসলিম লীগ সরকার ও পশ্চিমাদের বাঙালি বিরোধী অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালেই তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মিছিলের নেতৃত্ব দেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেন।

তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীও তাঁকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে মেনে নিতে, কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দকেই গ্রহণ করতে। গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছে, ' শেখ মুজিবুর রহমান ডিজঅ্যাপ্রুভড দি সাজেশন অব মিস্টার সোহরাওয়ার্দী টু গিভ রিজিওনাল স্ট্যাটাস অব বেঙ্গলি। শেখ মুজিবুর রহমান রিসিভড দি সাজেশনস অব মিস্টার সোহরাওয়ার্দী থ্রু এ লেটার।' অন্য কর্মীরাও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একমত হলো না।' (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জীবন ও রাজনীতি, সম্পাদক মোনায়েম সরকার)।

শেখ মুজিবের পেছনে গোয়েন্দারা ছায়ার মতো লেগে থাকত। তিনি কখন কী করতেন, সেই ১৯৪৮-১৯৪৯ সাল থেকেই তাঁর সম্পর্কে রিপোর্ট করা হতো সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতো। গ্রেপ্তারের পরই তাঁর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। তাঁকে জামিনের জন্য কোর্টে নেওয়া হলে সেখানেও ভিড় জমে যেত। তিনি সেই জনতার উদ্দেশে আবার বক্তৃতা করতে শুরু করতেন মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে। ১৪ মার্চ ১৯৫১ এ শেখ মুজিবের গতিবিধি সম্পর্কে সরকারি নথিতে বলা হচ্ছে,

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপালগঞ্জ কোর্ট থেকে ১৪ মার্চ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছু সংখ্যক ছাত্র মিছিল সহকারে তাঁকে নিয়ে বের হয়ে আসে ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবুর রহমান সভায় ভাষণ দেন। তিনি মওলানা ভাসানীসহ অন্যদের বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মুজিবুর রহমানকে সেদিনই গ্রেফতার করা হয়। ... পরের দিন তাঁর মুক্তির দাবিতে গোপালগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। স্থানীয় ছাত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ও ফ্রান্স কর্তৃক মরক্কোর ওপরে নিপীড়নের প্রতিবদে মিছিল করে। মিছিল শেষে সভায় শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য লড়াই করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই ছিল ওই সময়কার নিত্য চিত্র। শেখ মুজিব জেলজুলুমকে পরোয়া করতেন না। সাহস, দেশপ্রেম আর আপোসহীনতা ছিল তাঁর রক্তের কণায়।

সরকারি গোয়েন্দারা তাঁর মুচলেকা আদায়ের চেষ্টা করেছেন, তিনি কখনো মুচলেকা দিতেন না, বলতেন, সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি করেই যাবেন। এখন সেই গোয়েন্দাদের সরকারি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, তাঁরা বলতেন, এই বন্দির অবস্থান খুব শক্ত। তাঁকে টলানো যায় না।

১৯৫১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি খুলনা কারাগারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের রিপোর্ট দিচ্ছেন জনৈক গোয়েন্দা ২৬ ফেব্রুয়ারিতে, 'হি

ওয়াজ নট উইলিং টু এক্সিকিউট এনি বন্ড ফর রিলিজ ইভেন অফ দি ডিটেনশন উড কজ হিম টু ফেস ডেথ। হিজ অ্যাটিচুড ওয়াজ ভেরি স্টিফ'। এই বাক্যগুলো খেয়াল করুন, যদি তাঁর অন্তরীণ থাকাটা তাঁর মৃত্যুও ডেকে আনে, তবু তিনি কোনো মুচলেকায় স্বাক্ষর করবেন না। তাঁর মনোভাব ছিল ভীষণ অনড়। যতবার যতজন গোয়েন্দা তাঁর কাছে বন্ড স্বাক্ষর করাতে গেছেন, ততবার তাঁরা একই মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন, একই কথা লিখেছেন। ২২ মে-র গোয়েন্দা রিপোর্টেও বলা হচ্ছে, 'তিনি (মুজিব) তাঁর অতীতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে মোটেও অনুতপ্ত নন, বরং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তাঁর মুক্তির পর একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাবেন। মুক্তি পেতে তিনি খুবই আগ্রহী, কিন্তু মুক্তির জন্য কোনো বন্ডে তিনি সই না করার ব্যাপারে স্থিরচিত্ত।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় কারাগারে বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। তাঁকে কিছুতেই খাওয়ানো যাচ্ছিল না। তাঁর হার্ট দুর্বল ছিল, জীবনহানির আশংকা দেখা দিল। শেষে সরকার তাঁর প্রতিজ্ঞার কাছে নতি স্বীকার করল। তিনি মুক্তি পেলেন। টুঙ্গিপাড়ায় গেলেন। সে সময়ের একটা ঘটনা তিনি অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

> একদিন সকাল আমি ও রেণু বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর 'আব্বা আব্বা' বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। একসময় কামাল হাচিনাকে বলছে, "হাচু আপা, হাচু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।" আমি আর রেণু দু'জনই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, 'আমি তো তোমারও আব্বা'। কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে ঝুলে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন ও আর সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস।

শেখ মুজিব লড়ছেন বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, তাই তাঁকে জীবনের অনেকটা সময় কাটাতে হয়েছে কারাগারে। শেখ মুজিব যদি তাঁর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বড়ো করে দেখতেন, বেগম মুজিব যদি তাঁর পরিবারের সুখ ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন যে-কোনো সাধারণ নারীর মতো, তাহলে এই দেশটা এত সহজে স্বাধীন হতো না। বঙ্গবন্ধু নিজের প্রাণের ভয়ে কোনোদিনও ভীত ছিলেন না। ওই ১৯৫১ সালে কারাগারে জেরা করতে আসা গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে তিনি যে কথা বলেছেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা-ই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র, যদি মৃত্যু আসে আসুক, তবু বাংলার মানুষের মুক্তির প্রশ্নে কোনো আপোশ নয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর ফাঁসি হতে পারত, ওই সময় বন্দিশালায় তাঁকে গুলি করে মারার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমি দুই দুইবার মরতে মরতে বেঁচে গেছি। প্রথমবার আয়ুব খানের বন্দিশালায় ষড়যন্ত্রের মামলায়। আমার এক সাথী আমাকে সতর্ক করে দেয় যে, সন্ধ্যাবেলা সেলের বাইরে গিয়ে নিয়মিত বেড়ানোর ব্যাপারটি বিপজ্জনক। পেছন থেকে গুলি করবে আর বলবে পালিয়ে যাচ্ছিল বলে গুলি করেছি। অন্যের বেলা ঘটেও ছিল ওরকম গুলি চালনা। দ্বিতীয়বার ইয়াহিয়া খানের কারাগারে। আমার সামনেই আমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। বুঝতে পারছি যে আমার সময় ঘনিয়ে আসছে।' (অন্নদাশংকর রায়)।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে এইভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। একাত্তর সালে যখন পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, তখন তাঁর মৃত্যুদণ্ড স্থির হয়ে গিয়েছিল, তাঁর জন্য সেলের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। সামান্য আপোশ বাংলাদেশের মুক্তির পথকে বাঁকা আর দুর্গম করে তুলতে পারত। তা তিনি করেননি।

অন্যদিকে আছেন বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রিয় রেণু। কী অসাধারণ এক নারীই না পেয়েছিলাম আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে! যাঁর কথা ইতিহাসে আসে না। কারণ, নারী ও পরিবারের সদস্যদের ত্যাগ আর অবদানের কথা থেকে যায়

ইতিহাসের অন্তরালে। আমাদের ইতিহাসের দুটো খুব মাহেন্দ্রক্ষণে বেগম মুজিব নীরবে আমাদের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতিকে ইতিবাচকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। একটা হলো ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময়। শেখ মুজিব তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। ওই সময় একটা গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। সারাদেশে প্রচণ্ড আন্দোলন হচ্ছে। আর এই সময় শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে যাবেন আইয়ুব খানের সঙ্গে বৈঠক করতে! বেগম মুজিব তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালেন বড়ো মেয়ে হাসিনাকে। শেখ হাসিনার হাতে চিরকুট দিলেন। শেখ হাসিনাও সেই চিরকুটের বার্তাটা মুখস্থ করে নিলেন যদি প্রহরীরা চিরকুট কেড়ে নেয়! বেগম মুজিবের বার্তাটা ছিল, সারা দেশের মানুষ তোমার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত, খবরদার তুমি প্যারোলে মুক্তি নিবা না। যদি তুমি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আস, আমি তোমার বিরুদ্ধে পল্টনে সভা করব। (শেখ হাসিনার কিছু স্মৃতি কিছু কথা, মঞ্জুরুল ইসলাম, সময় প্রকাশনী)।

সেই বার্তা বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। শেখ মুজিব সেদিন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি প্যারোলে মুক্তি নেননি। বঙ্গবন্ধু হিসেবে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে এসেছিলেন।

একাত্তরের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় যোগ দিতে যাবেন বঙ্গবন্ধু। তিনি খুব অস্থির। একদিকে ছাত্রজনতার প্রচণ্ড চাপ, আজই স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে হবে। অন্যদিকে সারা পৃথিবী তাকিয়ে আছে ওই ভাষণটির দিকে। এমনকি আমেরিকার ক্ষমতাকেন্দ্রও নির্ঘুম অপেক্ষা করছিল শেখ মুজিব কী বলেন তা জানার জন্য। ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স যদি আসে, তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত পাকিস্তানি মিলিটারি। এই অবস্থায় কী করবেন বঙ্গবন্ধু! নিজের ঘরে তিনি পায়চারি করছেন। বেগম মুজিব তাঁকে বললেন, তুমি এত অস্থির কেন। শুয়ে খানিকক্ষণ রেস্ট নাও। মুজিব শুয়ে পড়লেন। তাঁর মাথার কাছে মোড়া নিয়ে বসা শেখ হাসি-

না, পায়ের কাছে বেগম মুজিব। বেগম মুজিব বললেন, তুমি তোমার নিজের বিবেকের কথা বলবা। তোমার সামনে লক্ষ মানুষের হাতে বাঁশের লাটি, পেছনে বন্দুক। তুমি তা-ই বলবা, যা তোমার অন্তর বলতে চায়। শেখ মুজিব খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে উঠলেন। যাওয়ার আগে বেগম মুজিবের কপালে চুম্বন করলেন। খানিকটা দেরি করেই তিনি পৌঁছালেন সভামঞ্চে। মানুষ তখন অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, নির্মলেন্দু গুণের ভাষায়,

'কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
... গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর
অমর কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এত ত্যাগ, এত বীরত্ব, এত ভালোবাসা, এত প্রজ্ঞা দিয়ে মানুষটি আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন! ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে স্বাধীনতা ঘোষণার ওই দিবাগত রাতে তিনি সাংবাদিক আতাউস সামাদকে বলেছিরেন, "আই হ্যাভ গিভেন ইউ ইন্ডেপেন্ডেস, নাউ প্রিজার্ভ ইট" (আজকের কাগজ- ২২/১/৯৩)। আতাউস সামাদ বলেছেন, ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু তাকে বলেছিলেন, 'আমি ইউডিআই দিচ্ছি (ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স বা স্বাধীনতার একতরফা ঘোষণা)। আমি তোদের স্বাধীনতা দিয়ে গেলাম, যা, তোরা রক্ষা কর।'

ইথারে ছড়িয়ে পড়ল সেই ঘোষণা,
আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

১৯৭২ সালে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজ এই মুহূর্তে অতীতের দিকে তাকিয়ে আপনি কোন

দিনটিকে আপনার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন বলে গণ্য করবেন?

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিন।'

ফ্রস্ট : এমন দিনের স্বপ্ন আপনি কবে থেকে দেখতে শুরু করেন?

শেখ মুজিব : বহুদিন ধরে আমি এই স্বপ্ন দেখে আসছি।

তাঁকে হত্যা করার জন্য বারবার সব আয়োজন সম্পন্ন করে পাকিস্তানিরা তাঁকে মারতে পারেনি! ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার আগে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, 'আমাকে আর দুটো দিন সময় দিন, আমি শেষ কাজটা করে নিই, শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ডটা কার্যকর করি।

সেই মৃত্যুদণ্ড সেদিন কার্যকর হয়নি। হয়েছে আরও চার বছর পরে। আর তাঁর প্রাণ কেড়ে নেবে বাঙালিরা, এটা বঙ্গবন্ধু কোনোদিনও ভাবতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে, এই সব তথ্য বিভিন্নভাবে তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়েছিল, এমনকি ভারতীয়রাও এই তথ্য জানাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছিল। আমেরিকার অবমুক্ত নথি থেকে আমরা আজ তা জানি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালিদের বিশ্বাস করতেন নিজের চেয়েও বেশি। তিনি মৃত্যুকে ভয় পেতেন না, আর এটা তাঁকে বিশ্বাস করানো অসম্ভব ছিল যে, কোনো বাঙালি তাঁকে আঘাত করতে পারে। তিনি বলেছিলেন, তার সবচেয়ে বড়ো গুণ হলো তিনি তাঁর দেশের মানুষকে বেশি ভালোবাসেন। আর তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো, তিনি দেশের মানুষকে একটু বেশিই ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাস তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে হত্যা করেছে যারা, তাদের ভাষা ছিল বাংলা, তাদের হাতে ছিল গরিব বাঙালির রক্ত পানি করা টাকায় কেনা অস্ত্র। শুধু বঙ্গবন্ধু নন, শুধু বেগম মুজিব নন, শিশুপুত্র রাসেল, গর্ভবতী পুত্রবধূও রেহাই পায়নি সেই হত্যাকাণ্ডের রাতে!

জাতির পিতাকে হত্যা করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকেই পেছনের দিকে ফেরানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা হলো নানাভাবে। কিন্তু দিন যতই যাচ্ছে, ততই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন তিনি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালির জাতির পিতা। বিবিসি বাংলার জরিপে যে উঠে এসেছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তার যথার্থ কারণ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে তিনিই বাঙালিকে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথা দুটো সমার্থক হয়ে উঠেছে।

সূত্র : প্রথম আলো, ১৫.০৮.২০১৬



১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড

বাংলাদেশের রাজনীতির ক্রান্তিলগ্নে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘটে যায় বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা। এদিন সামরিক বাহিনীর কয়েকজন তরুণ অফিসারের নেতৃত্বে গভীর রাতে আক্রমণ করা হয় বঙ্গবন্ধুর বাসভবন। সৈনিকরা নির্মমভাবে হত্যা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা, ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, সুলতানা কামাল (নব-বিবাহিতা পুত্রবধূ), রোজী জামাল (নব-বিবাহিতা পুত্রবধূ), শেখ আবু নাসের (বঙ্গন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা), কর্নেল জামিল (ডিজি, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ), কর্তব্যরত পুলিশের জনৈক ডিএসপি, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, আরিফ সেরনিয়াবাত-এর পুত্র : ১২ বছর), বেবী সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর কন্যা : ১৪ বছর), শহীদ সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর ভ্রাতুষ্পুত্র), বাবু সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর দৌহিত্র : ৫ বছর), নান্টু (সেরনিয়াবাত-এর ভাগিনেয়), শেখ ফজলুল হক মণি (দৈনিক বাংলার বাণী সম্পাদক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ) এবং বেগম শামসুন্নেসা মণি (সন্তান সম্ভবা) ও গৃহভৃত্যদের।

বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় সৌভাগ্যক্রমে সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান।

১৬ আগস্ট সামরিক বাহিনীর দুজন মেজর বঙ্গবন্ধুর ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া লাশ বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে তাঁর গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যায়। সেখানেই পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। এভাবেই শেষ হয় মহান নেতার জীবন।

বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে তাঁর আদর্শ আর তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ এ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে থাকবে অনন্তকাল। আপন কীর্তি, আপন আদর্শ আর দেশবাসীর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার বিনিময়ে বাংলাদেশের মানুষের মনের মাঝে চির অমর

হয়ে বেঁচে থাকবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু সে স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। তিনি সারাটা জীবন মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন। আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি শুধু তারই জন্য।



১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের ঐতিহাসিক বাড়িতে ঘাতকের বুলেটে মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের আদ্যপান্ত

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতহাসে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। ওই কালোরাতে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল :

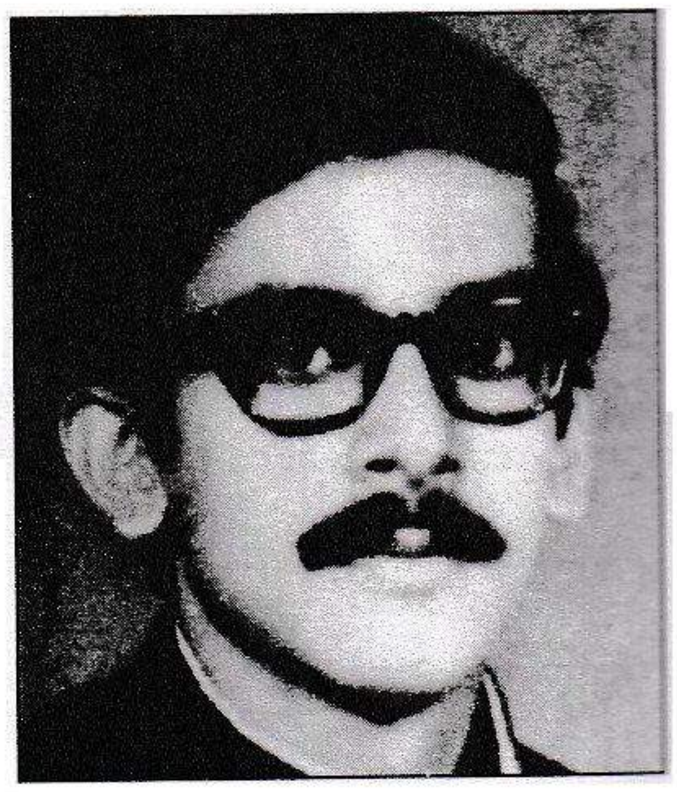
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বেগম ফজিলুতুন্নেসা মুজিব (রেনু)
শেখ কামাল (বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে)
সুলতানা কামাল (নব-বিবাহিতা শেখ কামালের স্ত্রী)
শেখ জামাল (বঙ্গবন্ধুর মেঝ ছেলে)
রোজী জামাল (নব-বিবাহিতা শেখ জামালের স্ত্রী)
শেখ রাসেল (বঙ্গবন্ধুর ৮ বছরের ছোট ছেলে)
শেখ আবু নাসের (বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই)
কর্নেল জামিল (ডিজি সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ)
কর্তব্যরত পুলিশের জনৈক ডিএসপি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (মন্ত্রিসভার সদস্য)
আরিফ সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর ১২ বছরের ছেলে)
বেবী সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর ১৪ বছরের মেয়ে)
শহীদ সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর ভাইয়ের ছেলে)
বাবু সেরনিয়াবাত (সেরনিয়াবাত-এর ৫ বছরের দৌহিত্র)
নান্টু (সেরনিয়াবাত-এর ভাগ্নে)
শেখ ফজলুল হক মণি (দৈনিক বাংলার বাণীর সম্পাদক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্)
বেগম শামসুন্নেসা মণি (সন্তান সম্ভবা শেখ ফজলুল হক মণির স্ত্রী) প্রমুখ।



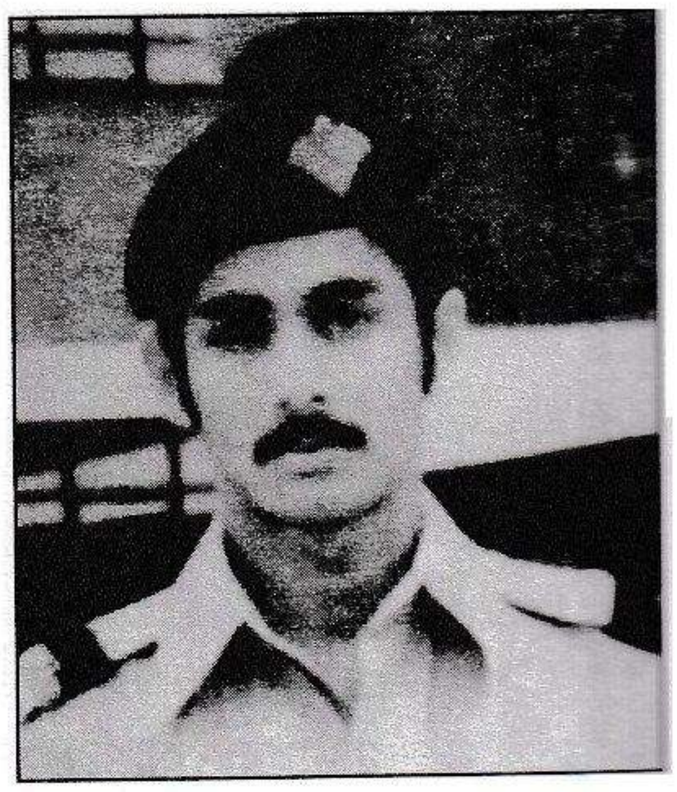
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯২০
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
জন্ম : ৮ আগস্ট, ১৯৩০
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



শেখ কামাল
বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে
জন্ম : ৫ আগস্ট, ১৯৪৯
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



শেখ জামাল
বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় ছেলে
জন্ম : ২৮ এপ্রিল, ১৯৫৪
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।

শেখ রাসেল
বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র
জন্ম : ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



সুলতানা কামাল
শেখ কামালের স্ত্রী
জন্ম : ১৯৫১
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।

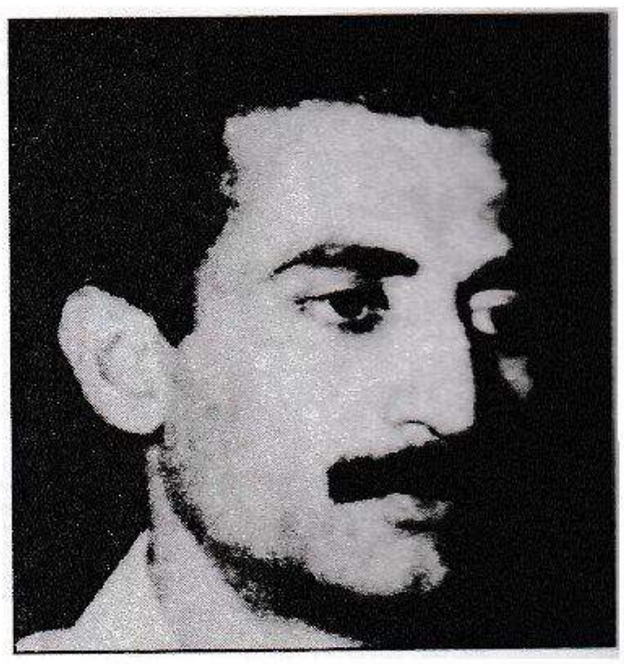


পারভীন জামাল রোজী
শেখ জামালের স্ত্রী
জন্ম : ১৯৫৬
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



শেখ আবু নাসের
বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই
জন্ম : ১৯২৮ সাল
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।





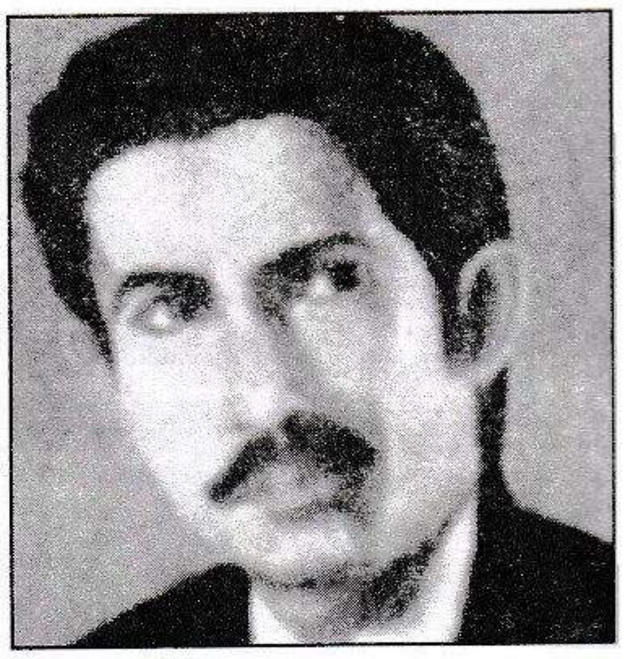
শেখ ফজলুল হক মনি
বঙ্গবন্ধুর মেঝ বোনের বড় ছেলে
জন্ম : ৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সাল
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



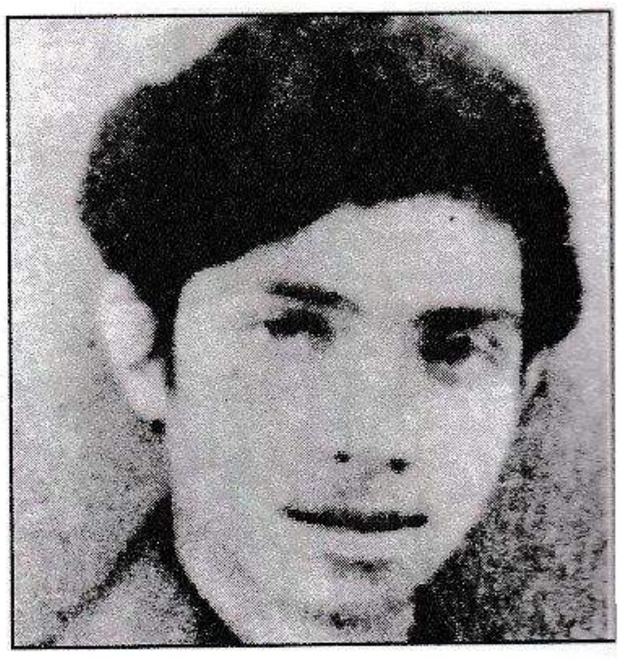
বেগম আরজু মনি
শেখ ফজলুল হক মনির স্ত্রী
জন্ম : ২০ মে, ১৯৬০ সাল
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ
বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার
জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ সাল
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।



শহীদ সেরনিয়াবত
আব্দুর রব সেরনিয়াবাত-এর ভাইয়ের ছেলে
জন্ম : ২৬ মার্চ, ১৯৪০
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।

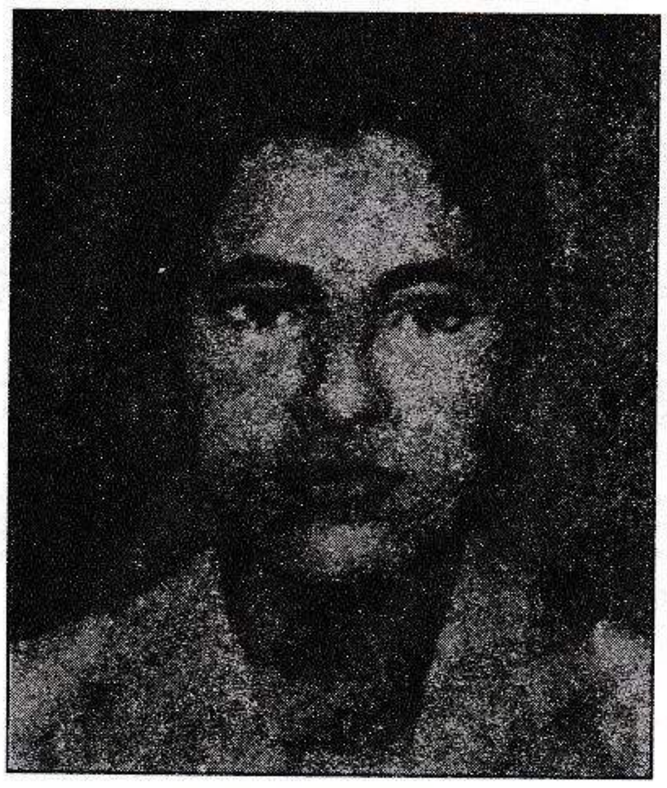


আবদুর নঈম খান রিন্টু
জন্ম : ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৭ সাল
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ।

আবদুর রব সেরনিয়াবাত
বঙ্গবন্ধুর সেজ বোনের স্বামী
জন্ম : ১৪ চৈত্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।



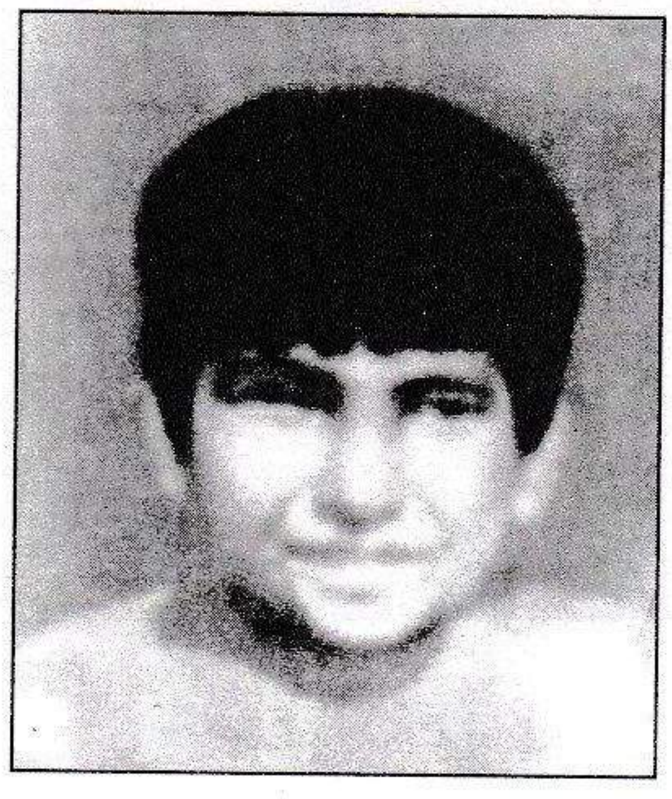
বেবী সেরনিয়াবাত
আব্দুর রব সেরনিয়াবাত-এর মেয়ে
জন্ম : ২০ মে, ১৯৬০ সাল
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।



আরিফ সেরনিয়াবত
আব্দুর রব সেরনিয়াবাত-এর ছোট ছেলে
জন্ম : ২৭ মার্চ, ১৯৬৪
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।



সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু
আব্দুর রব সেরনিয়াবাত-এর নাতি
মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।





টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর দাফন

হত্যাকাণ্ড সমাধা হলেও খুনীরা বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফন নিয়ে পড়ে সমস্যায়। তাঁর লাশ এখন কোথায় দাফন করা হবে? সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধুর আত্মীয়দের লাশ দাফনের একটি ব্যবস্থা করে দিলেন। বেগম মুজিব এবং তাদের তিন পুত্র ও দুই পুত্রবধূকে কোনো রকম কাফন এবং জানাজা না করেই রক্তাক্ত অবস্থায় বনানীতে কবর দেওয়া হল। এমনকি তাদের কবর চিহ্নিত করা হল না।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের লাশ কোথায় দাফন করা হবে– এই নিয়ে দেখা দিল সমস্যা। কেউ কেউ বললো, ঢাকাতেই কবর দেয়া হোক। একথা শুনে আঁৎকে উঠলো সবাই। না, তা হতে পারে না। তা হলে যে ঐ কবরস্থান গোটা বাঙালি জাতির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে! তখন ঐ কবরই জীবিত মুজিবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে ছিঁড়ে খাবে। খেপে যাবে বাংলার মানুষ। তাহলে কি করা হবে? অতঃপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল তাঁর কবর লোকচক্ষুর অন্তরালে পাঠাতে



দাফনের পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর মরদেহ

হবে, আর সেটা হবে তার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায়। শেখ মুজিবের লাশ টুঙ্গিপাড়াতেই দাফন করা হবে। টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর এই লাশ দাফনের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন জনাব এ এল খতিব– তার "who killed Majib" গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থের এই অংশের বঙ্গানুবাদ নিচে দেয়া গেল–

একজন মেজর ও একজন লেফটেন্যান্ট কিছু সৈন্যসহ মুজিব হত্যার একদিন পরে হেলিকপ্টার নিয়ে টুঙ্গিপাড়াতে নামলো। ভীত গ্রামের লোক অনেকেই পালিয়েছে। তারা ইমামকে ডাকলো এবং জিজ্ঞেস করলো গ্রামের লোকেরা মুজিবের লাশকে কবর দিতে সম্মত কিনা। পেশ ইমাম বললেন, লাশ তাঁদের হাতে দিলে তারা নিশ্চয়ই কবর দিবেন। সৈন্যরা বললো, দশ-বারোটা কবর তৈরি করতে হতে পারে, তবে আপাতত একটি কবর যেন তৈরি থাকে– তারা মুজিবের লাশ নিয়ে শীঘ্রই ফেরত আসবে। হেলিকপ্টার নিয়ে তারা ফেরত গেল।

দুপুর আড়াইটার দিকে হিলেকপ্টার বঙ্গবন্ধুর লাশ নিয়ে ফেরত এলো। ততক্ষণে গোপালগঞ্জের এসডিও একদল পুলিশ নিয়ে টুঙ্গিপাড়াতে উপস্থিত হয়েছেন। কফিনে আবদ্ধ লাশ নামানো হলো। সামরিক অফিসাররা চাইলেন কফিনসুদ্ধ লাশ কবরে নামিয়ে মাটি দেয়া হোক। গ্রামের লোকেরা ও পেশ ইমাম আপত্তি জানালেন, তাহা হতে পারে না, কেননা তা ইসলাম সম্মত নয়।

"তাহলে লাশ নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কবর দিতে হবে।"

গ্রামের লোকেরা বললেন, "তাঁরা লাশ দেখবেন।"

'না দেখে মাটি দেয়া যায় না?" সামরিক অফিসারগণ জিজ্ঞেস করলেন।

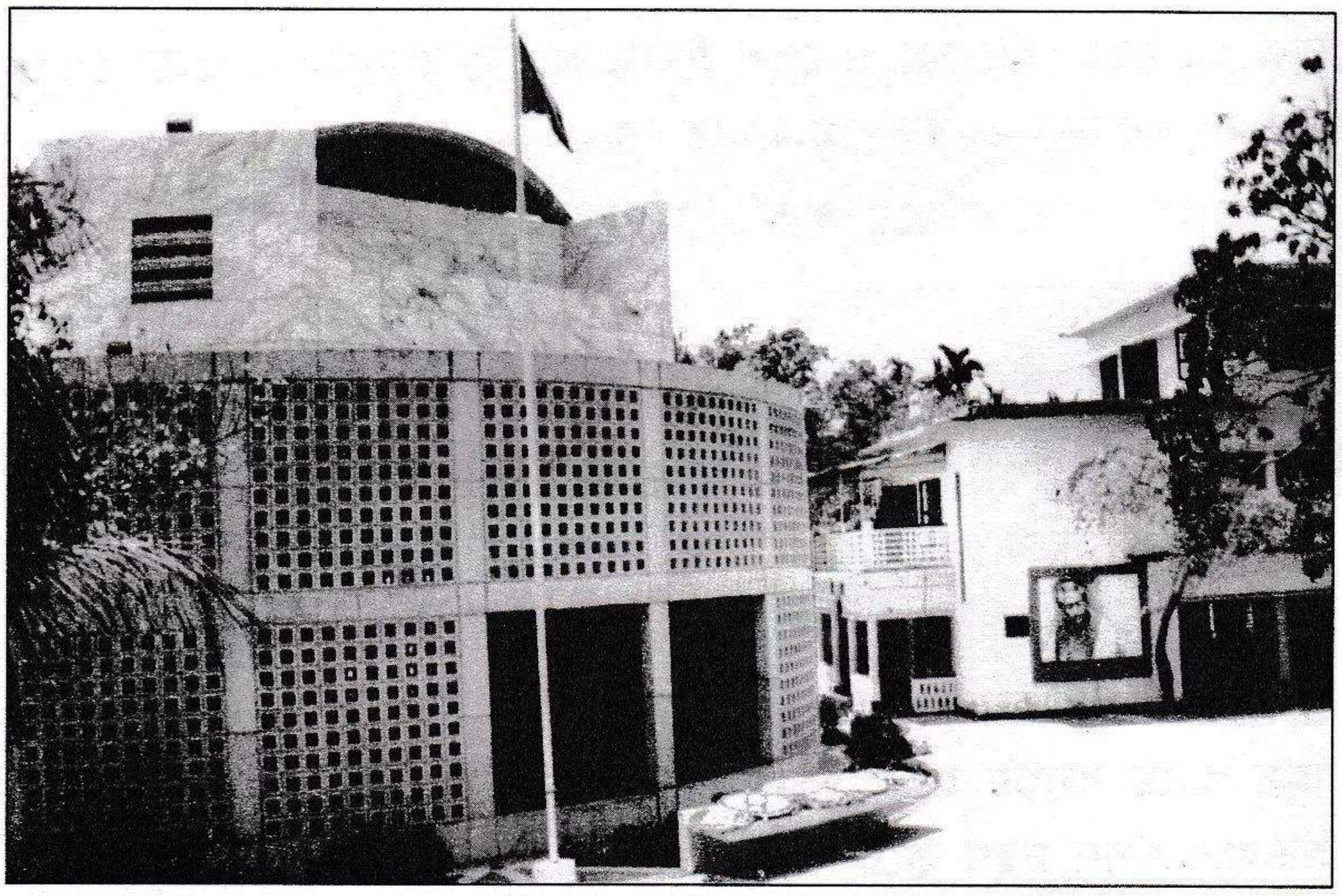
"হ্যাঁ, দেয়া যায়, তবে ঘোষণা করতে হবে যে, মুজিব একজন শহিদ"-পেশ ইমাম উত্তর করলেন।

গ্রামের মসজিদের পেশ ইমাম মৌলভী শেখ আব্দুল হালিমের সাহস আছে বলতে হবে, কেননা ততক্ষণে বঙ্গবন্ধুর অনেক সহকর্মী বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করে মন্ত্রী হয়েছেন।

অফিসাররা কি বলবে ভেবে পেল না। অবশেষে মৌলভী সাহেবকে তারা জানালো, "আপনারা কি এই লাশকে কাফন ও দাফন করবেন? না হলে হয় না?"

"না, দাফন ও কাফন ছাড়া চলবে না।"–মৌলভী হালিম জানালেন।

সবাই তখন নিশ্চুপ। কেননা তাদের ওপর কর্তাদের নির্দেশ মুজিবের লাশ যেন গ্রামের লোকেরা দেখতে না পায়। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যদি ইসলামী মতে মুজিবকে কবর না দেয়া হয়, তাহলে গ্রামের লোকেরা গোলমাল করতে পারে। ততক্ষণে কয়েক গ্রামের অনেক লোক জমে গেছে। অবশেষে মেজর জানালো, "ঠিক আছে, কাফন ও দাফন করা হোক, কিন্তু তাদের সাক্ষাতে সবকিছু করতে হবে।" কাফন খোলা হলে দেখা গেল বঙ্গবন্ধুর শরীর গুলিতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কাফন রক্তে ভিজে গেছে। অবশেষে সৈন্য ও পুলিশ লাশের চারদিকে কর্ডোন করে দাঁড়ালো। কিন্তু ক্রমেই জনতার চাপ বাড়ছে। যে কোনো সময় কর্ডোন ভেঙ্গে পাড়তে পারে। ভীত লেফটেন্যান্ট গর্জে উঠলো, "শীঘ্রই কাজ সম্পন্ন করা হোক, দেরি হচ্ছে কেন?" মেজর চিৎকার করে বললো, "ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।"



গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির জনকের সমাধি

মুজিবের গ্রামের সকল দোকান বন্ধ। একজন বহুকষ্টে একটি কাপড় কাচা সাবান নিয়ে এলো। তাঁকে সর্বশেষ গোছল দেবার জন্যে। পানি গরম করবার সময়ও পাওয়া গেল না। ঠাণ্ডা পানিতেই গোসলের কাজ শুরু করা হলো। কিন্তু রক্ত পরিষ্কার না হতেই কুকুরের মত মেজরটি চীৎকার করে উঠলো– "আর কত সময় এবার শেষ করো।"

মুজিবের মাতা সায়রা খাতুনের নামে নির্মিত গ্রামের হাসপাতাল থেকে চারটি শাড়ি নিয়ে আসা হলো। তার লাল পাড়গুলো ছাড়িয়ে মুজিবের লাশকে কাপড়ে জড়ানো হলো। কিন্তু অফিসাররা সেলাইয়ের সময় দিতে প্রস্তুত নয়। অতএব ঐ অবস্থাতেই লাশ কবরের কাছে নিয়ে আসা হলো। সামরিক অফিসাররা বললো, জানাজার আর কি দরকার? মৌলানা সাহেব ঘোরতর আপত্তি করলেন। অবশেষে জানাজা পড়ানো হলো। উপস্থিত পুলিশরা অজু করবার সময় চাইলেন। তাঁরাও জানাজায় শরিক হতে চান। কিন্তু তাদেরকে সেই সময় দেয়া হলো না।

মুজিবকে তার পিতার কবরের পাশে সমাধিস্থ করা হলো। পশ্চিমাকাশের সূর্য তার উজ্জ্বল রশ্মি ছড়িয়ে বিষণ্ন নয়নে মুজিবকে চির অন্ধকারের জগতে বিদায় জানালো।



জিয়া-এরশাদ-খালেদা যেভাবে খুনীদের পুরস্কৃত ও পুনর্বাসন করেন!

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ঘাতকচক্রকে বিদেশে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে খন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকার। আর জিয়াউর রহমান রক্তপিপাসু হিংস্র খুনীদের প্রায় সবাইকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত ও পুনর্বাসিত করেন। পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ ও জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একই পথ অনুসরণ করে খুনীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পুরস্কৃত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। অন্যদিকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করেছেন পিতৃহত্যার বিচার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার থেকে। বিচার পেতে ৩৪টি বছর অপেক্ষা করতে হলেও খুনীদের পুনর্বাসনে কার কি ভূমিকা, আর এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের নায়ক ও বেনিফিশিয়ারি কারা তা দেশবাসীর সামনে এখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরই নেপথ্যের নায়কদের মুখোশ উন্মোচিত হতে থাকে দেশবাসীর সামনে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে জাতিকে প্রগতি-সমৃদ্ধির অগ্রমিছিল থেকে কেন পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল, হিংস্র রক্তপিপাসু হায়েনার দল দেশীয়-আন্তর্জাতিক কাদের মদদে এমন রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছিল, কালের বিবর্তনে তাও জাতির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ঘাতকচক্রকে বিদেশে পালিয়ে যেতে সহায়তা করে খন্দকার মোশতাক। জিয়াউর রহমান এদের প্রায় সবাইকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কূটনৈতিক পদে নিয়োগ দিয়ে পুনর্বাসিত করেন। এরশাদ সরকারও হত্যাকারীদের তোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। এরশাদের আমলেই খুনীরা রাজনৈতিকভাবে

পুনর্বাসিত হয়ে প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করে। আর জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। বিদেশে পলাতক খুনীকে বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেয়া হয়। জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের দিন পনেরো আগস্ট মিথ্যা জন্মদিন পালনের নামে উল্লাস করে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পক্ষে তাঁর অবস্থান সুস্পষ্ট করেন।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যার পর জনরোষ থেকে খুনীদের অব্যাহতি দিতে তৎপরতা শুরু করে খন্দকার মোশতাক সরকার। ৩ নভেম্বর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দফায় দফায় আলোচনার পর খুনী মেজরদের দেশত্যাগের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় ফারুক-রশিদসহ খুনী ১৭ সামরিক কর্মকর্তা ব্যাঙ্ককগামী প্লেনে নির্বিঘ্নে দেশ ছেড়ে চলে যায়। প্লেনটি চট্টগ্রামে রিফিলিং করে সরাসরি ব্যাঙ্ককের পথে উড়ে যায়। সরকারি অর্থে খুনীরা নির্বিঘ্নে বিদেশে অবস্থান করতে থাকে।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয় এর পর থেকেই। পালিয়ে যাওয়া ১৭ মেজর বিদেশে অবস্থানের সময় ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আত্মস্বীকৃত খুনী কর্নেল রশিদ ও কর্নেল ফারুক দেশে আসে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে বনিবনা না হওয়ায় ওই দুই খুনী জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে বগুড়া সেনানিবাসে বিদ্রোহ শুরু করে। অবস্থা বেগতিক দেখে জিয়াউর রহমান ফারুক-রশিদকে জোর করে লিবিয়ায় পাঠিয়ে দেন। লিবিয়ায় ব্যবসা শুরু করে ফারুক-রশিদরা সেখান থেকে রাষ্ট্রবিরোধী নানা তৎপরতা চালাতে থাকে।

১৯৭৫ সালের ৮ জুন জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ১২ খুনীকে বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত ও পুনর্বাসিত করেন। এর আগে খুনী ডালিম, আজিজ পাশা, শাহরিয়ার রশিদ, আহমেদ শরিফুল হোসেন, বজলুল হুদা, নূর চৌধুরী, রাশেদ চৌধুরী, একেএম মহিউদ্দীন, নাজমুল হোসেন, কিসমত হোসেন, খায়রুজ্জামান ও মাজেদের চাকরি সামরিকবাহিনী থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। তাদের নিয়োগ দেয়া হয় বিভিন্ন দূতাবাসে।

এর মধ্যে খুনী ডালিমকে চীনে, আজিজ পাশাকে আর্জেন্টিনা ও মুহিউদ্দিনকে আলজেরিয়ায় প্রথম সচিব, শাহরিয়ারকে ইন্দোনেশিয়া,

বজলুল হুদাকে পাকিস্তানে, রাশেদ চৌধুরীকে সৌদি আরবে, নূর চৌধুরীকে ইরানে ও আহমেদ শরিফুল হোসেনকে কুয়েতে দ্বিতীয় সচিব এবং কিসমতকে আবুধাবিতে, খায়রুজ্জামানকে মিসরে, নাজমুলকে কানাডায়, মাজেদকে সেনেগালে তৃতীয় সচিব পদে নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে তারা আরও বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি করেছে। ১৯৮০ সালে খুনীদের চাকরি পররাষ্ট্র ক্যাডার সার্ভিসে খুনী ফারুক ও রশিদ সরকারি চাকরি নেয়নি।

১৯৮০ সালের ১৭ জুন ঢাকায় একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান হয়। খুনী হুদা পাকিস্তানে ও শাহরিয়ার ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব এবং ডালিম চীনে প্রথম সচিব পদে নিযুক্ত ছিল। এই অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার দায়ে আটক হতে পারে আশঙ্কায় বজলুল হুদা, শাহরিয়ার রশিদ খান ও ডালিম কর্মস্থল ছেড়ে তখন পালিয়ে যায়। অভ্যুত্থানে জড়িত থাকার অভিযোগে আজিজ পাশাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ওই মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে ছাড়া পায় এবং রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসে আবার কূটনীতিকের দায়িত্ব পায়। এছাড়া দেশে অবাধে যাতায়াতসহ জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে নানান রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে খুনীরা। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ব্যাপারে সাবেক স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও জিয়াউর রহমানের নীতি অনুসরণ করেন। এরশাদ সরকারের আমলেই বঙ্গবন্ধুর খুনীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ওই সময়ই নির্ভয়ে দেশে ফিরে আসে পাষণ্ড খুনী হুদা ও শাহরিয়ার। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ) নামে একটি রাজনৈতিক দলও গঠন করে। এরশাদের সঙ্গে সমঝোতা করে খুনী ফারুক-রশিদরা ঢাকায় আসে এবং ফ্রিডম পার্টি নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ফ্রিডম পার্টির উপদেষ্টা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট করা হয় আরেক খুনী রশিদকে। ফ্রিডম পার্টির কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য লিবিয়ায় পাঠানো হয়। তারা প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে এসে যুব কমান্ড গঠন করে।

এরশাদ সরকার ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আত্মস্বীকৃত খুনী ফারুককে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেয়। ১৯৮৭ সালে বিতর্কিত সংসদ নির্বাচনেও ফ্রিডম পার্টি অংশ নেয় এবং বজলুল হুদাকে বিজয়ী করে পবিত্র সংসদে বসার সুযোগ করে দেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে ফ্রিডম

পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। এক পক্ষে নেতৃত্ব দেয় সৈয়দ ফারুক রহমান, অপর অংশে থাকে কর্নেল রশিদ। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে যুব কমান্ডের সশস্ত্র ক্যাডারদের ধরপাকড় শুরু হয়। খুনী ফারুক, শাহরিয়ার গ্রেফতার হওয়ায় রশিদ ও বজলুল হুদা পালিয়ে যায়।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলেও খুনীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ দেয়া হয়।

আগেরবার ক্ষমতায় থাকতেও খালেদা জিয়া তাঁর বিতর্কিত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনে আত্মস্বীকৃত খুনী রশিদকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করিয়ে বিরোধী দলের নেতা পর্যন্ত বানান। ১৯৯১-৯৬ বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় বঙ্গবন্ধুর খুনীরা চাকরিতে পদোন্নতি পায়। স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেও একই ধারা বজায় রাখে। আওয়ামী লীগ আমলে বিদেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বঙ্গবন্ধুর এক খুনীকে চাকরিচ্যুত করেছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে ওই খুনীর চাকরি ফিরিয়ে দিয়ে অবসরকালীন সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

এমনকি জোট সরকারের আমলে কানাডায় অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর খুনী নূর চৌধুরীকে গোপনে বাংলাদেশের পাসপোর্ট দেয়ার অভিযোগ ওঠে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অনেক খুনীই গোপনে দেশে যাতায়াত করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। ৩৪টি বছর ধরে নানা কায়দায় খুনীদের রক্ষা করা হলেও এখন প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতকিছুর পরও আত্মস্বীকৃত খুনীরা রেহাই পাচ্ছে না। সকল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে সর্বোচ্চ আদালত থেকে চূড়ান্ত রায় ঘোষিত হচ্ছে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে খুনীদের দণ্ড কার্যকর হবে, জাতি দীর্ঘদিন পর পিতৃহত্যার কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে– সেটি দেখার অপেক্ষায় এখন পুরো দেশবাসী।



একনজরে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স (দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি)

১২ আগস্ট ১৯৯৬ : বিশেষ ক্ষমতা আইনে কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমানসহ ৩ জন গ্রেফতার।

২ অক্টোবর ১৯৯৬ : ধানমণ্ডি থানায় মামলার এজাহার।

১২ নভেম্বর ১৯৯৬ : জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে একটি বিল পাস।

১৫ জানুয়ারি ৯৭ : ফৌজদারী কার্যবিধির ১২০ (বি), ৩০২/৩৪, এবং ২০১ ধারায় চার্জশীট দাখিল।

২০ জানুয়ারি ৯৭ : গ্রেফতারকৃত আসামীদের আদালতে হাজির।

২৮ জানুয়ারি ৯৭ : ইনডেমনিটি বাতিল আইন চ্যালেঞ্জ মামলায় হাইকোর্ট থেকে বাতিলের আইনটি বৈধ ঘোষণা।

৩ ফেব্রুয়ারি ৯৭ : পলাতক আসামীদের নামে গেজেট নোটিস জারি।

১ মার্চ ৯৭ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশে বিশেষ এজলাস গঠন। বিচারক কাজী গোলাম রসুল। রাষ্ট্রপক্ষের পিপি হন সিরাজুল হক।

১২ মার্চ ৯৭ : শুরু হয় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা।

৭ এপ্রিল ৯৭	:	মামলার অভিযোগ গঠন।
৬ জুলাই ৯৭	:	সাক্ষীদের সাক্ষ্য দান শুরু।
২০ জুলাই ৯৮	:	সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষ।
১২ আগস্ট ৯৮	:	সওয়াল-জবাব শেষে রায় প্রদানের তারিখ ঘোষণা।
১৩ অক্টোবর ৯৮	:	সওয়াল-জবাব শেষে রায় প্রদানের তারিখ ঘোষণা।
৮ নভেম্বর ৯৮	:	মেজর (অব) বজলুল হুদাকে ব্যাঙ্কক থেকে দেশে আনা হয়।
১১ নভেম্বর ৯৮	:	হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স পাঠানো হয়।
৩০ মার্চ ২০০০	:	বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ডেথ রেফারেন্স ও আপিল হাইকোর্টে শুনানির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।
১০ এপ্রিল ২০০০	:	একটি বেঞ্চে বিচারপতি আমিরুল কবীর মামলাটি শুনতে বিব্রত বোধ করেন।
২৪ এপ্রিল ২০০০	:	অপর একটি বেঞ্চের বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন ও বিচারপতি আব্দুল মতিন বিব্রত বোধ করেন।
২ মে ২০০০	:	পলাতক আসামীদের স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ।
৩ মে ২০০০	:	সম্পূরক পেপারবুক তৈরির নির্দেশ।
২৮ জুন ২০০০	:	হাইকোর্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা শুরু।
১০ জুলাই ২০০০	:	হাইকোর্টে সম্পূরক পেপারবুক জমা।
১৮ জুলাই ২০০০	:	সওয়াল-জবাব শুরু।
২২ অক্টোবর ২০০০	:	হাইকোর্টে আসামীপক্ষের বক্তব্য শেষ সরকারপক্ষের যুক্তি শুরু।
২৮ নভেম্বর ২০০০	:	হাইকোর্টে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি শেষ।
১৪ ডিসেম্বর ২০০০	:	হাইকোর্ট বেঞ্চ থেকে বিভক্ত রায় ঘোষণা।

১৪ জানুয়ারি ২০০১	:	বিভক্তি রায়ের নিষ্পত্তি করতে প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়।
১৫ জানুয়ারি ২০০১	:	বিচারপতি ফজলুল করিমকে তৃতীয় বিচারপতি নিয়োগ করে হাইকোর্ট পর্যায়ে ডেথ রেফারেন্স ও আপিল নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ।
১৭ জানুয়ারি ২০০১	:	তৃতীয় বিচারপতি আদালতে বসেন। তিনি শুধু দ্বিমত থাকা আসামীদের বিষয়ে শুনানি করবেন বলে জানান।
২৪ জানুয়ারি ২০০১	:	লে. কর্নেল (অব) মহিউদ্দীন আহম্মেদ-এর (আর্টিলারি) স্ত্রী শাহিদা মহিউদ্দীন ডিমান্ড অব জাস্টিস নোটিস পাঠান।
১২ ফেব্রুয়ারি ২০০১	:	শুনানি শুরু (তৃতীয় বিচারপতির আদালতে)।
১৯ এপ্রিল ২০০১	:	শুনানি শেষ।
২০ এপ্রিল ২০০১	:	তৃতীয় বিচারপতির রায় ঘোষণা।
১৩ মার্চ ২০০৭	:	লে. কর্নেল (অব) একেএম মহিউদ্দীন আহম্মেদ (ল্যান্সার) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার।
১৮ জুন ২০০৭	:	একেএম মহিউদ্দীন আহম্মেদকে (ল্যান্সার) দেশে আনা হয়।
২ আগস্ট ২০০৭	:	হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আসামীদের দায়ের করা লিভ টু আপিলের ওপর শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠন।
৭ আগস্ট ২০০৭	:	বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম, বিচারপতি জয়নাল আবেদীন ও বিচারপতি মো. হাসান আমিনের আপিল বিভাগের বেঞ্চে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার লিভ টু আপিলের ওপর শুনানি গ্রহণ শুরু।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ : আপিল বিভাগ ২৫ কার্যদিবসে শুনানি গ্রহণ করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামীর আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ (লিভ মঞ্জুর) করে।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ : পেপারবুক ৩০ অক্টোবরের মধ্যে আদালতে জমা দিতে সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়।

২৩ আগস্ট ২০০৯ : রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তির সংক্ষিপ্ত সার আপিল বিভাগে জমা দেয়া হয়।

২৪ আগস্ট ২০০৯ : আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানির জন্য ৫ অক্টোবর তারিখ নির্ধারণ করেন।

৪ অক্টোবর ২০০৯ : বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল নিষ্পত্তির জন্য ৫ সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গঠন। বেঞ্চের অন্যান্য সদস্য হলেন– বিচারপতি মো. আব্দুল আজিজ, বিচারপতি বিজন কুমার দাস (বি কে দাস), বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন ও বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা)।

৫ অক্টোবর ২০০৯ : সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানি ২৯ কার্যদিবসে শেষ। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায়ের তারিখ ঘোষণা ১৯ নভেম্বর।



বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় : কলঙ্কমুক্ত হলো বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় হাইকোর্টের রায়বহাল
১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড

১৯ নভেম্বর, ২০০৯ বৃহস্পতিবার। ঘড়ির কাঁটায় তখান বেলা ১১টা ৪৬ মিনিট। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা শুরু করলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম। রায় শেষ করলেন ১১টা ৫৮ মিনিটে। পাঁচ আসামীর আপিল খারিজ, মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল–এ রায়ের মাধ্যমে শেষ হলো ১৩ বছর ধরে চলা বিচার প্রক্রিয়া। দায়মুক্ত হলো রাষ্ট্র, কলঙ্কমুক্ত হলো জাতি। ওইদিন বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে এজলাসে বসেন আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি। আদালতকক্ষে তখন পিনপতন নীরবতা। আসন গ্রহণের পর আসামীদের আপিলের বিষয়ে ৮ পৃষ্ঠার রায় পড়া শুরু করেন। বিশেষ বেঞ্চের নেতৃত্বদানকারী বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম। মাত্র ১২ মিনিটে রায়ের সংক্ষিপ্ত আদেশ দেন আদালত। বলা হয়, এই সংক্ষিপ্ত আদেশ মূল রায়ের অংশে থাকবে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামীর আপিলের পাঁচ যুক্তির ওপর রায় দেন আপিল বিভাগ।

আসামিরা হলেন

সৈয়দ ফারুক রহমান, বজলুল হুদা, আর্টিলারি মুহিউদ্দিন, ল্যান্সার মহিউদ্দীন আহমেদ ও সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান। আইনজীবীরা জানান, আপিল খারিজ হওয়ায় হাইকোর্টের রায় অর্থাৎ ১২ আসামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল থাকল। কারণ, অপর ৭ আসামী আপিল করেননি। ফলে তাদের ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের রায় বহাল রয়েছে। রায় ঘোষণা শেষে উপস্থিত আইনজীবীরা উল্লাস প্রকাশ করেন। এ সময়

বাদী আ ফ ম মুহিতুল ইসলাম দুই হাত তুলে বলেন, 'আমাদের জয় হয়েছে।'

রায় দেওয়ার কথা ছিল বেলা ১১টায় আপিল বিভাগের এক নম্বর কক্ষে। নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট পর ওই কক্ষে রায় ঘোষণা শুরু হয়।

১৯ নভেম্বরের রায়

পাঁচ আসামীর লিভ টু আপিল গ্রহণের ৫টি যুক্তি খণ্ডন করে আপিল বিভাগ ৬টি অভিমত দেন। আদালতের পর্যবক্ষেণে বলা হয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কোনো আইনানুগ তথ্য-প্রমাণ নেই যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তিন নিরাপত্তারক্ষীসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিহত হওয়ার ঘটনা সেনা বিদ্রোহের ফল।

পর্যবেক্ষেণে বলা হয়, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা বিশ্বাস করেন, রাষ্ট্রপক্ষ বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে আবেদনকরীদের ও অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আবেদনকারীরা এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, হাইকোর্ট বিভাগ বড় ধরনের অবিচার করেছেন অথবা ডেথ রেফারেন্স গ্রহণ করে বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। যদিও এটা আবেদনকারীদের বিষয়, তবু যথাযথ মূল্যায়ন ও উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়া রায়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাইনি।

আপিল বিভাগ আরও বলেন, আসামীরা তাদের বিরুদ্ধে দেওয়া সাজা কমানোর পক্ষে কোনো যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি। আমরা হাইকোর্ট বিভাগ ও দায়রা জজের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পরিবর্তন করাকে সমীচীন মনে করিনি। এসব বিবেচনায় আপিল বিভাগ আসামীদের আপিল খারিজ করে দেন। এই রায়ের মাধ্যমে আগের সব স্থগিতাদেশ বাতিল করা হয়েছে।

রায়ের প্রতীক্ষায়

সোয়া ১১টায় আইনজীবীদের ভিড়ে আদালতকক্ষে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

১১টা ৪৫ মিনিটে; অপেক্ষার পালা শেষ। এজলাসে আসেন আপিল শুনানিতে নেতৃত্বদানকারী আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম, বিচারপতি মো. আব্দুল আজিজ, বিচারপতি বিজন কুমার দাস, বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন ও বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। এ সময় আদালতে পিনপতন নীরবতা। বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের বাঁ দিকে প্রথমে বসেন বিচারপতি বিজন কুমার দাস, তার পাশে বসেন বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের ডানদিকে প্রথমে বসেন মো. আব্দুল আজিজ, তার পাশে বসেন বিচারপতি মো. মোজাম্মেল হোসেন। আসন গ্রহণের পর ৮ পৃষ্ঠার রায় পড়ে শোনান বিচারপতি মো. তাফাজ্জাল ইসলাম।

এজলাসে বাঁ পাশের প্রথম বেঞ্চে বসেন রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি আনিসুল হক, পাশে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম, শেখ ফজলে নূর তাপস, আব্দুল মতিন খসরু প্রমুখ। অপর পাশে ছিলেন আসামীপক্ষের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন ও আবদুর রেজ্জাক খান। রায়ের সময় পাঁচ শতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

যাদের মৃত্যুদণ্ড বহাল

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১২ আসামীর মধ্যে কারাবন্দী পাঁচ আসামী হলেন–সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহারিয়ার রশিদ খান, মুহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিরারি), বজলুল হুদা ও একেএম মহিউদ্দীন আহমেদ (ল্যান্সার)।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্য ৬ আসামী পলাতক। তারা হলেন– খন্দকার আব্দুর রশিদ, শরিফুল হক ডালিম, এএম রাশেদ চৌধুরী, এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, আবদুল মাজেদ ও মোসলেম উদ্দিন। বাকি একজন আজিজ পাশা মারা গেছেন। তারা সবাই সাবেক সেনা কর্মকর্তা।



স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে নিয়োগ করা হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি– প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয় তাজউদ্দীন আহমদকে। ইতিহাসে এই অস্থায়ী সরকারকে মুজিবনগর সরকারও বলা হয়। এ সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। ঐতিহাসিক সেই ঘোষণাপত্রে বলা হয় :

মুজিবনগর, বাংলাদেশ
১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন

এবং

যেহেতু আহুত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুণতি গণহত্যা ও নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে

এবং

যেহেতু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য,

মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি

এবং

এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন

এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শনসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,

তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মূলতবির ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে-কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে-দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতা এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম।

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫)

১৯৫৫

৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengali'. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebicite.

[অনুবাদ : স্যার আপনি দেখবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তার নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কি না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই বা কি ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব তারা যেন আমাদের জনগণের 'রেফারেন্ডাম' অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেয়া রায়কে মেনে নেন।]

২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে খসড়া শাসনতন্ত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ১৪ জুলাই আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আনেন বঙ্গবন্ধু। ৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করা হয়। চকবাজার এলাকায় পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে ৩ জন নিহত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৭

সংগঠনকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ২৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই তিনি চীনে সরকারি সফর করেন।

১৯৫৮

৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১১ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হয়। প্রায় চৌদ্দ মাস জেলখানায় থাকার পর তাঁকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেটেই গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬০

৭ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সামরিক শাসন ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এ সময়ই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দ দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন।

১৯৬২

৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২ জুন চার বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটলে ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিলাভ করেন। ২৫ জুন বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি দেন। ৫ জুলাই পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু লাহোর যান, এখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধীদলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। অক্টোবর মাসে

গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সারা বাংলা সফর করেন।

১৯৬৩

সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্য লন্ডন যান। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন।

১৯৬৪

২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সভায় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। দাঙ্গার পর আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ গ্রহণ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের। এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬

৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয়ে নির্বাচনী কমিটিতে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। প্রস্তাবিত ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধু

আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার পক্ষের জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বারবার গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধু এ বছরের প্রথম তিন মাসে আটবার গ্রেফতার হন। ৮ মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুন বঙ্গবন্ধু ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে ঘর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের সময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়।

১৯৬৮

৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।

১৯৬৯

৫ জানুয়ারি ৬ দফাসহ ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণ, বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ

অন্যান্য আসামিকে মুক্তি দানে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্রজনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণে ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডিতে আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপস্থান করে বলেন, 'গণঅসন্তোষ নিরসনে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।' পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও রাজনীবিদরা বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করলে ১৩ মার্চ তিনি গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন এবং ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। ২৫ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তিন সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন।

৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন, 'একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০

৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭ জুন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১৭ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে 'নৌকা' প্রতীক পছন্দ করেন এবং ঢাকার ধোলাইখালে প্রথম নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। ২৮ অক্টোবর তিনি জাতির উদ্দেশে বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ১২ নভেম্বরে গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় ১০ লক্ষ মানুষের আর্তমানবতার প্রতি পাকিস্তানী শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি গোর্কি উপদ্রুত মানুষের ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১

৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ গ্রহণ করেন। ৫ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বাধিক আসন লাভকারী পাকিস্তান পিপল'স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তাঁর সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন। ২৮ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। তিন দিন বৈঠকের পর আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়ে দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানান।

১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু এক বিবৃতিতে জনাব ভুট্টোর দাবির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'ভুট্টো সাহেবের দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।'

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষণা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি বৈঠকে ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ৩ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'। ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান এবং ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপরদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্ব সড়ক থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যেত, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলতেন। অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা সবই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনেছে। ইয়াহিয়ার সব নির্দেশ অমান্য করে অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার মানুষের সেই অভূতপূর্ব সাড়া ইতিহাসে বিরল ঘটনা। মূলত ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসাবে বঙ্গবন্ধুই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ১৬ মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। আলোচনার জন্য জনাব ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা হয়। ২৫ মার্চ আলোচনা ব্যর্থ হবার

পর সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন :

This may be my last message, from to-day Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soildier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

[অনুবাদ : এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষপর্যন্ত দখলদার সৈন্য বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।]

এই ঘোষণা বাংলাদেশের সর্বত্র ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাংলায় নিম্নলিখিত একটি বার্তা পাঠান :

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিযে

যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোস নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর এই বার্তা তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় সারা দেশে পাঠানো হয়। সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে বাঙালি জওয়ান ও অফিসাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং এর তিন দিন পর তাঁকে বন্দি অবস্থায় পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়।

২৬ মার্চ জে. ইয়াহিয়া এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (মুজিবনগর) বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ লাভ করে স্বাধীনতা। তার আগে ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফায়সালাবাদ (লায়ালপুর) জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়। ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জনক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে মুক্তি প্রদানের দাবি জানান হয়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর

মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, কাজেই পাকস্তিানের কোনো অধিকার নেই তাকে বন্দি করে রাখার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেদিনই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকার উদ্দেশে লন্ডন পাঠানো হয়। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে ঢাকা আসার পথে বঙ্গবন্ধু দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। বিমানবন্দরে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছালে তাঁকে অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে লক্ষ জনতার সমাবেশ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৬ ফেব্রুযারি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ভারত যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে দেয়া বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতীয় মিত্রবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

১ মে তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ৩০ জুলাই লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে তিনি জেনেভা যান। ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত করে। ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। প্রশাসনিকব্যবস্থার

পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নাম-মাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, ১১,০০০ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, ঘোড়াশাল সারকারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৭৩

জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৯৩ আসন লাভ। ৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপের সমন্বয়ে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু আলজেরিয়া যান। ১৭ অক্টোবর তিনি জাপান সফর করেন।

১৯৭৪

২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গমন করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং বঙ্গবন্ধু ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ দেন।

১৯৭৫

২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দলে যোগদানের জন্য দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে মানুসে আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা দেন যার লক্ষ্য ছিল– দুর্নীতি দমন; ক্ষেতে খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করবার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সকল রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চোরাকারবারি বন্ধ হয়। দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় চলে আসে।

নতুন আশার উদ্দীপনা নিয়ে স্বাধীনতার সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। কিন্তু মানুষের সে সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ

বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারের হাতে নিহত হন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুবনেতা ও সাংবাদিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিল আহমেদ এবং ১৪ বছরের কিশোর আবদুল নঈম খান রিন্টুসহ ১৬ জনকে ঘাতকরা হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হবার পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। গণতন্ত্রকে হত্যা করে মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। কেড়ে নেয় জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষার জন্য হত্যাকারীদের বিচারের বিধান রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাতির জনকের খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স) জারি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামে এক কুখ্যাত কালো আইন সংবিধানে সংযুক্ত করে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করে। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যগণকে হত্যার বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করা হয়। ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলা করা হয়। ১ মার্চ '৯৭ ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়। ৮ নভেম্বর '৯৮ জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল ৭৬ পৃষ্ঠার রায় ঘোষণায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান

করেন। ১৪ নভেম্বর ২০০০ সালে হাইকোর্টে মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলে দুই বিচারক বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক দ্বিমতে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। এরপর পাঁচজন আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল করে। ২০০২-২০০৬ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় মামলাটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। ২০০৭ সালে শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠিত হয়। ২০০৯ সালে ২৯ দিন শুনানির পর ১৯ নভেম্বর প্রধান বিচারপতিসহ পাঁচজন বিচারপতি রায় ঘোষণায় আপিল খারিজ করে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি আপিল বিভাগে আসামিদের রিভিউ পিটিশন দাখিল এবং তিন দিন শুনানি শেষে ২৭ জানুয়ারি চার বিচারপতি রিভিউ পিটিশনও খারিজ করেন। এদিনই মধ্যরাতের পর ২৮ জানুয়ারি পাঁচ ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ঘাতকদের একজন বিদেশে পলাতক অবস্থায় মারা গেছে এবং ছয়জন বিদেশে পলাতক রয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি ৩৪ বছর পর বাস্তবায়িত হলো।

১৫ আগস্ট জাতির জীবনে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে বাঙালি জাতি পালন করে।*

* জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এলবাম *জাতির জনক*, ৩য় প্রকাশ, ১৭ মার্চ ২০১০ থেকে উদ্ধৃত।